ভোলা মাষ্টার

অয়স্কান্ত বক্সী

রঙমহল রঙ্গমঞ্চে

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা

প্রথম সংস্করণ ৬ই জানুয়ারী ১৯৪৬
দ্বিতীয় সংস্করণ ৩রা জুন ১৯৪৬

এই নাটককে যিনি সাফল্যমণ্ডিত করেছেন

তাঁর অভিনয় ও অভিমতে,

পরম শ্রদ্ধেয় নটকুলতিলক

নাট্যাচার্য

নটসূর্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী

মহাশয়কে

এই নাটক উৎসর্গ করে

ধন্য হলাম

প্রীতিধন্য

অয়স্কান্ত

নিবেদন

সর্বাগ্রে যাঁকে নতি জ্ঞাপন করি, তিনি বর্তমান-বাঙলার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন সেনগুপ্ত। তাঁর ঋণ আমার অপরিশোধ্য। আমাকে তিনি নাট্যকার করেছেন, আমাকে তিনি নাট্যকাররূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তার পরেই মনে পড়ে আমার শিল্পীবন্ধুদ্বয় শ্রীযুক্ত রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্তোষ সিংহের কথা। কতনা-আনন্দ, কতনা-যত্ন, কতনা-শ্রম আমার নাটককে শ্রীসম্পন্ন করতে! আর ভুলবনা পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী রাণীবালার আগ্রহ ও উৎসাহ আমার নাটককে প্রথম অভিনয় করবার। ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন, এই আমার প্রার্থনা।

আর আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ যিনি এই নাটককে মঞ্চস্থ করবার সুবিধা দান করেছেন। তিনি আমার শিল্পীবন্ধু বর্তমান-রঙমহল-থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরৎ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

"ভোলা মাষ্টার কোন ব্যক্তি বিশেষের জীবন-কাহিনী নয়, বাংলার চির-উপেক্ষিত শিক্ষকদের এক প্রতিনিধি এই ভোলা মাষ্টার। বাংলার শিক্ষককুল জীবনের যে-আদর্শ লইয়া দুঃসহ দারিদ্র্যের ভিতর দিয়া জ্ঞানের আলোক-বর্তিকা বহিয়া লইয়া প্রতিদানে উপহাস, উপেক্ষায় ও অবহেলায় জীবন কাটাইতেছেন তাহারই মর্মস্পর্শী আলেখ্য এই ভোলা মাষ্টার!" * * *

আমার নাটক সম্বন্ধে শচীনদার এই অভিমতটি তুলে দিয়ে বলতে চাই যে, ঐ ছিল আমার নাটক লেখবার মূল উদ্দেশ্য। তখনও সন্দেহ ছিল নাটককে সাধারণে কী ভাবে নেবে। কিন্তু, রঙমহলের প্রতিদিনের পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগার এ সন্দেহ মোচন করেছে। সাধারণে নাটককে গ্রহণ করেছেন। সেই আমার পুরস্কার।

এই নাটকখানিতে অহীন্দ্রবাবুর নির্দেশ অনুযায়ী মধ্যে মাত্র একবার যবনিকা ফেলা হয়—যেখানে দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য শেষ হয়। সেই উদ্দেশ্যেই নাটকে নির্বচন দৃশ্যগুলির অবতারণা। আমি সেগুলিও এই নাটকে দিয়েছি এবং নাটকখানিকে চার অঙ্কে ভাগ করেছি অবৈতনিক সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে। ইচ্ছা করলে নির্বচন দৃশ্যগুলি তুলে দিয়ে, গতানুগতিক প্রথায় প্রতি অঙ্কের শেষে যবনিকা ফেলে অভিনয় করা যেতে পারে। কিন্তু, দ্বিতীয় অঙ্কের শেষের অন্ত্যরঙ্গ দৃশ্যটি অনিবার্য।

পরিশেষে আমার কবিবন্ধু শৈলেন রায় মহাশয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এই নাটকের একখানি মাত্র গান তিনিই রচনা করেছেন। আর তাতে সুর সংযোজনা করেছেন রঙমহলের সুদর্শন গায়ক-অভিনেতা স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত তারাকুমার ভট্টাচার্য।

রঙমহলের সকল শিল্পীবন্ধুগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, যাঁদের প্রত্যেকের সাহায্যই আমার সম্পদ। স্থানাভাবে তা ব্যক্ত করতে অক্ষম হলাম। ইতি—

৬ই জানুয়ারী
১৯৪৩

অয়স্কান্ত বক্সী

চরিত্র

ভোলা মাষ্টার	...	গ্রাম্য ইস্কুলমাষ্টার
কৃপাময়ী	...	ঐ স্ত্রী
সমরেন্দ্র	...	ঐ পুত্র (শিশু, বালক ও যুবক)
সর্বেশ্বর	.	গ্রাম্য প্রতিবেশী
ছোট-বৌ	...	ঐ স্ত্রী
রাধারাণী	...	ঐ কন্যা
বৃন্দাবন	..	ইস্কুলের দপ্তরী
অকিঞ্চন	...	ঐ পুত্র (বালক)
বৌ-গিন্নী	...	জমিদার পত্নী
অমরনাথ	...	ঐ পুত্র
সিন্ধুর-মা	..	প্রতিবাসিনী
লোকনাথ	..	ইস্কুলের হেডমাষ্টার
রাখাল বাঁড়ুজ্জে নিবারণ	...	গ্রামবাসী
পোষ্টমাষ্টার	...	পোষ্টঅফিসের কর্মকর্তা
কেলো	...	ডাক পিওন
মিঃ চাটার্জি	...	জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট
উল্কা	...	ঐ কন্যা
তপেন	...	পুলিশসাহেব
হরিমতী	...	গ্রাম্য ভিখারিণী
কেষ্টচন্দর	...	সমরেন্দ্রের বেয়ারা
ঝড়ু	...	উড়ে মালী

ছাত্রগণ ও জনতা

প্রথম রজনীর অভিনেতৃবর্গ

পুরুষ

ভোলানাথ	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
সমরেন্দ্র	..	" রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
লোকনাথ	...	" সন্তোষ সিংহ
মিঃ চাটার্জি	...	" শরৎ চট্টোপাধ্যায়
সর্বেশ্বর	...	" সন্তোষ দাস
তপেন	...	" ভানু চাটার্জি
অমরনাথ	...	" তারাকুমার ভট্টাচার্য
রাখাল	...	" আশু বসু
নিবারণ	...	" প্রফুল্ল দাস
বাঁড়ুজ্জে	...	" জীবন চাটার্জি
কেলো	..	" যতীন দাস
কেষ্ট	...	" অমূল্য হালদার
ঝড়ু	...	" গোপাল মুখার্জি
বৈষ্ণব	...	" বিশ্বনাথ সোম
অকিঞ্চন	...	শ্রীমান সনৎ মুখার্জি
জনতা	...	কমল, তিনকড়ি, রামকৃষ্ণ, তুলসী, নবদ্বীপ, রণজিৎ, পুলিন, কানু, চণ্ডী ও অজিত।

স্ত্রী

কৃপাময়ী	...	শ্রীমতী রাণীবালা
ছোট-বৌ	...	" সুহাসিনী
বৌ-গিন্নী	...	" বেলারাণী
সিন্ধুর-মা	...	" আঙ্গুরবালা
রাধারাণী	...	" রমা ব্যানার্জি
উমা	...	" বন্দনা
হরিমতী	...	" দুর্গাবালা

রঙমহল

প্রথম অভিনয়, বৃহস্পতিবার, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৭২

স্বত্বাধিকারী—শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়

নাট্য-নির্দেশক—শ্রীরতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসন্তোষ সিংহ

মঞ্চশিল্পী—শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস (নানুবাবু)

তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়

গীতিকার—" শৈলেন রায়

সুর-শিল্পী—শ্রীতারাকুমার ভট্টাচার্য

পরিচ্ছদ—শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায় (কমলালয়)

স্মারক—শ্রীকালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
" শচীন ভট্টাচার্য

আলোক সম্পাত—শ্রীখগেন্দ্রনাথ দে (বোস।)
" শচীন ভৌমিক, মদন
দাস, শ্যামসুন্দর কর

বেশকারিগণ—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায়
" রাজকৃষ্ণ মহাপাত্র
" নিরঞ্জন ঘোষ
" সুবোধ মুখোপাধ্যায়
সেখ বেচু

মঞ্চ-মায়াকরগণ—শ্রীকেশব ঘোষ, ভুবন দাস,
" ভূষণ সামন্ত, কালিপদ
সোম, গোপাল দাস,
" অমূল্য দাস, কানাই দাস,
রামচন্দ্র ঘোষ, গৌরীরাম দাস

নবকুমার সরাই

ভোলা মাষ্টার

দৃশ্য—ইস্কুল হলের ইঙ্গিত-গর্ভ দৃশ্য

ইস্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠে। ছেলেদের নেপথ্য কোলাহল স্তব্ধ হয়। হেডমাষ্টার মহাশয় শান্ত সৌম্য মূর্তিতে এসে হলের মধ্যভাগে দাঁড়ান

হেডমাষ্টার। বস বস! খুশির সঙ্গে তোমাদের জানাচ্ছি যে, আজ এই ইস্কুলের চতুর্বিংশতিতম বাৎসরিক। তোমাদের গ্রামের এই ইস্কুল তার চতুর্বিংশতি বৎসর অতিক্রম ক'রে পঞ্চবিংশতি বৎসরে পদার্পণ করবে। তার অতীত দীর্ঘ চব্বিশ বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করলে জানতে পারবে যে, যে-জননী একদিন ছিলেন বন্ধ্যা আজ তিনি পুত্রবতী হ'য়েছেন। তাঁর শত পুত্র দিকে দিকে অভিযানমুখী। সেই অভিযানের পথে পথে তাঁর চিত্তকে তারা নানা-ব্যক্তির মধ্যে ব্যপ্ত করবে, অনাগত কালের মধ্যে বহন করে চলবে। সেই পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের পুরোহিত কে? সে ঐ তোমাদের চির পরিচিত ভোলা মাষ্টার। তাঁরই অপূর্ব আত্মত্যাগ, একনিষ্ঠ সেবা ও তপস্যা এই ইস্কুলকে নিত্যতা দান করেছে। মাতার শত পুত্র আজ বিদ্বান, যশোমণ্ডিত। জনসভায় উঁচু আসনের অধিকারী। ভোলা মাষ্টার সাধারণ জনতার অপরিচয়। ইস্কুল মাষ্টার হারিয়ে যায় অপরিচয়ের অবজ্ঞায়। কিন্তু তার কীর্তি শাশ্বত হ'য়ে থাকে তার প্রতি ছাত্রের বুকে। ছাত্র তার প্রভাতের শুকতারা, ইস্কুল মাষ্টার অগণিত তারকাপুঞ্জের একটি ছোট্ট তারা। ছোট্ট তারাটির সান্ত্বনা কোথায়? সে বলে—আমি নিষ্প্রভ ঐ শুক তারাকেই মহিমান্বিত করতে। আমার সমস্ত উজার করে দিতে

পেরেছি বলেই না ফুটেছে ওর মহিমা! সেই তারার রূপক কথার রেশ টেনে বলি—আমি তো ক্ষুদ্র নই। ভোলা মাষ্টারের দল হারিয়ে যায়। উত্তর-কালে তারই মহিমা বহন করে চলে তার অসংখ্য ছাত্র। আজ এই পুণ্য দিনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই যেন তোমরা মাতার যোগ্য পুত্র হ'য়ে যশস্বী হ'তে পার। তোমাদের জ্ঞানের প্রতিভায় গ্রামের ও দেশের মুখোজ্জ্বল হ'ক। সেই আমাদের পুরস্কার। দরিদ্র ইস্কুল মাষ্টার ঐশ্বর্য্যের কাঙাল নয়। ছাত্রের কল্যাণ-কামনাই তার তপস্যা। আসন্ন তোমাদের পরীক্ষা। পরীক্ষায় সাফল্য লাভ ক'রে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হও, এই কামনা জ্ঞাপন ক'রে আমি বিদায় নিই। পরীক্ষায় অকৃতার্থতায় যেন তোমাদের মনে মাষ্টারের উপর দ্বেষ না জন্মে। অকৃতার্থতাই সাফল্যের সোপান। আজ তোমরা এখন যেতে পার, তোমাদের ছুটি।

প্রথম অঙ্ক

একখানি খোড়ো চালার ঘর। দেওয়ালে দু-চারখানি সস্তা দামের ঠাকুরদের পটের ছবি। একপার্শে একখানি তক্তাপোষ, তার উপর জমিয়ে রাখা একরাশ শয্যাদ্রব্য। তারই তলায় গোটা দুই সস্তা টিনের রঙকরা বাক্স। এক কোণে পানের বাটা। পশ্চাতের দেওয়ালে ছোট দুটো কাঠের জানালা। দক্ষিণের দেওয়ালে মাঝখানে একটি দরজা। মেটে মেঝের উপরে পাতা মাদুর, কোথাও বা তার খুলে গেছে। তারই উপরে এলোমেলো পড়ে আছে একরাশ পরীক্ষার খাতা। তারই মাঝখানে বসে আছেন ভোলা মাষ্টার। বয়স তাঁর বছর আটচল্লিশ। পরনে থান কাপড়, গায়ে পিরাণ, নাকে নিকেলের চশমা—একটা হাতল নেই! তার অভাব পূরণ ক'রে আছে এক গাছা কালো সুতো। ভোলানাথ খাতা দেখতে দেখতে হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠেন। আপন মনে বক্‌তে থাকেন। তাঁর স্বগত উক্তি অসঙ্গত কিছুই নয়—এ তাঁর একটি মুদ্রা দোষ। প্রাতঃকাল

ভোলা। এর আবার কিছু হবে! হবে না, হবে না, এই বলে দিলাম কিছু হবে না। ভোলা মাষ্টারের কথা হাতে হাতে ফলবে—হাতে হাতে ফলবে। বলেছিলাম ওর বাপকে, সেও হবে আজ ছাব্বিশ বচ্ছর আগে—কিচ্ছু হবে না। ওরে চাষা, চোদ্দ পুরুষের হালচাষ ছেড়ে এসেছিস পড়াশুনো করতে! তুই কি ভাবিস কোনকালে তোর কিছু হবে! পুরাণ-যুগের ত্রিশঙ্কুর অবস্থা যদি না হয়তো কী বলেছি। বিচারক! বানান লিখেছে বিচারক—বয়ে দীর্ঘ ঈ।

স্ত্রী কৃপাময়ী প্রবেশ করেন ষষ্ঠবর্ষীয় পুত্র সমরকে কোলে করে

কৃপা। ওগো শুনছ!

ভোলা। বয়ে দীর্ঘ ঈ বিচারক! না গিন্নী, কোন কথা আমি শুনব না। ভোলা মাষ্টার কোনদিন কারু ভুল মার্জনা করেনি। তোমার কথাতেও না। একে আমি শূন্যই দেব। দেব গোল্লা।

সে খাতায় একটা বৃত্ত এঁকে দেয়

কৃপা। কিন্তু—

ভোলা। তুমি কি ভেবেছ স্ত্রীর কথায়—

কৃপা। সে অপবাদ তো কেউ তোমাকে দেয়নি।

ভোলা। আমি যা নই, তা আমাকে বলে কার সাধ্য! মনে আছে গিন্নী, সেবার সেই ১৩১০ সনে। জমিদার দীনবন্ধুবাবুর ছেলে অমরনাথের জন্যে এলে তুমি বলতে বৌ-গিন্নীর অনুরোধে, তাঁর ছেলেকে পাশ নম্বর দিয়ে দিতে। তখন আর তোমার কত বয়স। তখনও না। ইন্দ্রের অপ্সরী ক্লান্ত হ'য়ে ফিরল, শিবের তপস্যা রইল অটল। আমি মত দিলাম না। তাকে সে বছর ঐ ক্লাসেই অপেক্ষা করতে হ'ল। জমিদারের দোর্দণ্ড প্রতাপও পাহাড় টলাতে পারলে না।

কৃপা। সেদিন যা জমিদার দীনবন্ধুবাবুর সয়েছিল, আজ কি তা এই গরীবের সংসারে সইবে? হয়তো তার ঘরের ভিত উঠবে না, বন্ধনও তার ঘুচবে মুক্তির পথে। বৃন্দাবন বোষ্টমের ছেলে অকিঞ্চন এসেছে।

ভোলা। কে?

কৃপা। তোমাদের ইস্কুলের দপ্তরী বেন্দা বোষ্টম গো!

ভোলা। ইস্কুলের দপ্তরী বৃন্দাবন—এখানে? তাকে তো আমি ডাকিনি। ও হো হো! বোধ করি হেডমাষ্টার মশায় পাঠিয়েছেন।

তিনি উঠবার উদ্যোগ করেন

যাই, শুনে আসি কী ব'লে পাঠিয়েছেন।

কৃপা। কোথায় চলেছ?

ভোলা। হেডমাষ্টার মশায় পাঠিয়েছেন, একবার শুনতে হবে না কী কথাটা—

কৃপা। হেডমাষ্টার মশায় আবার কখন বেন্দা বোষ্টমকে পাঠালে!

ভোলা। এই যে বললে।

কৃপা। আমি আবার কখন বললাম। আমি বলছিলাম, এসেছে অকিঞ্চন—বেন্দা বোষ্টমের ছেলে।

ভোলানাথ পুনরায় বসে চোখের চশমা টেনে খুলতে থাকে

ভোলা। বেটা চাষা! ওর কিছু হবে না, কিচ্ছু হবে না—বলে দেও। বিদ্যে চর্চার চেয়ে ক্ষেত চষা অনেক লাভের।

কৃপা। ছি, ওকি কথা! দিনে দিনে কি তোমাকে ভীমরতি ধরছে! মানুষের ছেলে এল মানুষের বাড়ীতে ঘর ব'য়ে, আর তাকে যা নয় তাই বলা! অমন কথা বলতে নেই, ওতে নিজের ছেলেরই অকল্যাণ হয়।

ভোলা। আমার ছেলের সঙ্গে ওর তুলনা! ঐ সমু, বলছি গিন্নী শুনে রাখ, একদিন হাকিম হবে। হাকিম সে হবেই।

কৃপা। ওর মা পাঠিয়েছে ওদের গাছের ছুছড়া কলা আর নতুন বাছুর বিয়নো গরুর এক ঘটি দুধ। তোমার পায়ে রেখে প্রণাম করতে বলেছে। তারই অপেক্ষায় ও দাঁড়িয়ে আছে উঠনে।

ভোলানাথ সহসা ক্ষিপ্তভাবে উঠবার প্রয়াস পায়

ভোলা। আমি জানি, ওদের চিনি। ওরা অমনি করেই ছেলেকে পাশ করিয়ে নিতে চায়। বৃন্দাবন জানে না! ওরই চোখের সামনে দিয়ে কাল খাতা নিয়ে আসিনি! আর, আজই পাঠিয়েছে ছেলেকে দুধকলা দিয়ে, ছেলের খাতার শূন্যের অঙ্ক পূর্ণ করে নিতে। ভোলা মাষ্টার কাউকে রেয়াত করে না। সেবার মনে পড়ে গিন্নী, সেই ১৩১৩ সনে। যতীশের পরীক্ষার খাতা তখনও আমার বাড়ীতে, নেমন্তন্ন হ'ল ওর বোনের বিয়েতে। আমি যাইনি, তোমাকেও যেতে দিইনি। এ নিয়ে কি কম কথা উঠেছিল। গাঁয়ের লোকে ঠাট্টা করে বললে, ভোলা মাষ্টার ন্যায়ের তর্কালঙ্কার। কেউ কেউ হেসে বললে, খেলে না অলঙ্কার খোয়া যাবার

ভয়ে। বদ্‌ছেলেরা নাম দিলে—নৈয়ায়িক। এত বড় বেন্দার আস্পর্ধা যে, সব জেনে শুনে পাঠালে দুধকলা!

কৃপা। সব জেনে শুনে বৃন্দাবন কখনই পাঠায় নি—তুমি নিশ্চিন্ত থাক। আর কেউ না চিনুক, বৃন্দাবন তোমাকে চেনে না! ক্লাসে যখন উপ্‌রি উপ্‌রি দু'সন ফেল করলে, তুমিই তো বলে ক'য়ে ইস্কুলের কাজে ঢুকিয়ে দিলে। নইলে তো ও গিয়েছিল আর কি। সখের যাত্রা দলের সুখটানে ও আজ কোথায় তলিয়ে যেত। সে জানে, তাই অত বড় ভুল সে কখনই করবে না।

ভোলা। তবে?

কৃপা। এ তার বউয়ের কাণ্ড। নতুন গাছের ফল, নতুন গরুর দুধ—বামুন বাড়ীতে না পাঠিয়ে কি খেতে পারে!

ভোলা। গাঁয়ে কি আর বামুন নেই?

কৃপা। বামুনের মত বামুন ক'জন আছে? তুমি আমার গুরু বলেও খোসামোদ করব না, অপরকেও অবজ্ঞা করি না। বৃন্দাবনের আজ যা চালচুলো সেতো তোমা হ'তেই, একথা ওর স্ত্রী ভুলবে কোন সুখে? না না, ফিরিয়ে দিয়ে ওর মায়ের মনে দুঃখ দিয়ো না।

ভোলা। তুমি কী বলতে চাও?

কৃপা। ওগো, আমি কিছুই বলতে চাইনে, ওকে ডেকে দিচ্ছি।

কৃপাময়ী বেরিয়ে যান। প্রবেশ করে ভয়ে ভয়ে অকিঞ্চন। বছর দশেক হবে।
এক হাতে কলাছড়া আর এক হাতে দুধ। পায়ের কাছে
রেখে সে প্রণত হয়

অকিঞ্চন। মা পাঠিয়ে দিলে। বললে, গুরুমশায়কে না দিয়ে নতুন জিনিষ খেতে নেই।

ভোলা মাষ্টারের হঠাৎ কী হয়। অন্ধ-ক্রোধে আত্মহারা হয়। লাথি মেরে
কলা সরিয়ে দেয়। দুধের ঘটি গড়াগড়ি যায়

ভোলা। দুধকলাতে ভোলা মাষ্টার ভোলে না। ভোলা মাষ্টার ভোলে পরীক্ষার খাতায়। সেখানকার ত্রুটি কোনদিন সে মার্জনা করেনি, আজও করবে না। মাকে বলবি, পরীক্ষার খাতায় নির্ভুল প্রশ্নোত্তর লিখলেই পাওয়া যায় ভোলা মাষ্টারের আশীর্বাদ, নইলে বিবাদ।

অকি। আমি জানি নে, মাই তো পাঠিয়ে দিলে। আমি বলেছিলাম, মাষ্টারমশায় হয়তো রাগ করবেন।

ভোলা। ওরে বেইমান, আমি তোদের ওপর রাগ করি। সকলে বলে ভোলা মাষ্টার রাগী, বদ্‌মেজাজি—এ দুর্নাম তার রইল!

রূপা। (নেপথ্যে) ওগো, ইস্কুল যাবার বেলা হ'ল, নাইতে যাও।

অকি। আমি যাই।

সে যাবার উদ্‌যোগ করে

ভোলা। দাঁড়া! দাঁড়া হতভাগা! বিচারক, বিচারক বানান কী?

অকি। (মাথা চুলকিয়ে) বয়ে দীর্ঘ ঈ চয়ে আকার—

ভোলা। (বিকৃত স্বরে) চয়ে আকার আর মূর্ধন্য ষয়ে আকার—

অকি। চাষা!

ভোলা। তুমি একটি নিরেট, অতি স্থূল চাষা! বিচারক—বয়ে দীর্ঘ ঈ? আর এটা লিখেছ কি তোমার মাথা? (খাতা পড়ে) "ব্রিটিশ ভারতে বিচারকের বিচারে যাকে ফাঁসীর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, তাহাকে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। এইজন্যেই আন্দামান প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।" এ্যাঁ! দুধ কলা নিয়ে এসেছ গলার ফাঁস কাটাতে? ফাঁসী। ফাঁসী মানে কী?

অকি। (মাথা চুলকে) ফাঁসী? ফএ চন্দ্রবিন্দু আকার—

ভোলা। মস্তিষ্কের বিকার! ওরে হতচ্ছাড়া, ফাঁসী মানে কি ফএ চন্দ্রবিন্দু আকার?

অকি। ও! না সার।

ভোলা। তবে ?

অকি। ফ ফ ফাঁসী! ফ ফ ফাঁসী মানে—

ভোলা। জান না ?

অকি। আজ্ঞে না।

ভোলা। তবে লিখলে কী করে ?

অকি। আমি ত লিখিনি সার।

ভোলা। লেখনি ? আবার মিথ্যে কথা ? ফাঁসী মানে কী ?

অকি। সার! ফ·· ফ···ফাঁসী ?

ভোলা। হ্যাঁ-হ্যাঁ ফাঁসী। ওরে বেটা চাষা! ফাঁসী মানে মৃত্যুদণ্ড। বিচারকের বিচারে যদি মৃত্যুই হ'ল সাব্যস্ত, তবে সে আন্দামানে পৌঁছয় কী করে ?

অকি। ষ্টীমারে সার।

ভোলা। ওরে বেটা শিববাহন! নির্বাসন, নির্বাসন। যে অপরাধীকে বিচারক নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করেন, সেইই যায় সাধারণত আন্দামানে। যাও বাড়ী যাও, এ শূন্য আর ঘুচবে না।

অকি। একটা ভুলের জন্যে কি সবই শূন্য হ'য়ে যাবে সার ?

ভোলানাথ অপরিসীম ক্রোধে তার কান ধরেন

ভোলা। ওরে হতভাগা! একটা ভুল! রাশি রাশি ভুল, পাতায় পাতায়, লাইনে লাইনে ভুলের পাহাড়-পর্বত জমে আছে। একটা ভুলে শূন্য দি আমি ? তারা বলে, তারা বলে—এই বদনামই আমার অক্ষয় হ'য়ে থাক। তবু ভুলের সংখ্যার অঙ্ক মিলিয়ে আমি পাশ নম্বর নিতে পারিনি, পারব না।

অকিঞ্চন কেঁদে উঠে

অকি। আর বলব না সার।

প্রবেশ করেন কৃপাময়ী

কৃপা। ওগো, ছেড়ে দেও, ছেড়ে দেও। পরের ছেলেকে বাড়ী পূরে মেরে ফেলবে নাকি ?

অকিঞ্চনের কান্নার বেগ বাড়তে থাকে। কৃপাময়ী তাকে জড়িয়ে ধরেন

ভোলা। মারব না! বলে কিনা আমি ওদের দেখতে পারিনে। অযথা বসিয়ে দি ওদের পরীক্ষার খাতায় শূন্য। এর ওপর আবার মিথ্যে কথা—বলে লিখিনি। জলজ্যান্ত খাতা আমার সম্মুখে—

কৃপা। ছি বাবা! গুরুমশায়ের সামনে কি মিথ্যে কথা বলতে আছে!

অকি। আমিত লিখে পরীক্ষা দিইনি। আমি দিয়েছি মুখে মুখে।

ভোলা। দেওনি ?

তিনি তাড়াতাড়ি বসে খাতার নাম পরীক্ষা করতে থাকেন

ওহোহো! ভুল হয়ে গেছে গিন্নী। এতো ওদের ক্লাসের খাতা নয়। কী নাম ? (ভাল করে নাম দেখে) না না না, এতো অকিঞ্চন বৈরাগী নয়, অকিঞ্চন চক্রবর্তী। বড় ভুল হয়ে গেছে গিন্নী। ইস্!

কৃপা। খামকা মারলে ছেলেটাকে। যাও বাবা বাড়ী যাও। গুরুমশায়ের অন্তর যে, তোমাদেরই কল্যাণ কামনা করে। তাঁর ওপর রাগ করতে নেই। মাকে বোলো, গুরু-মা তাঁর কলা আর দুধ গ্রহণ করেছেন, আর সর্বান্তঃকরণে জানিয়েছেন আশীর্বাদ।

অকিঞ্চন চোখ মুছে বেরিয়ে যায়। ভোলা মাষ্টার খাতা নিয়ে বসে

ওগো, আজ ইস্কুলে যেতে টেতে হবে নাকি! আমি যাচ্ছি, উনোনে তরকারি চাপিয়ে এসেছি! তুমি স্নানের উদ্যোগ কর।

কৃপাময়ী চলে যান। ভোলা মাষ্টার খাতা গুছোতে থাকে। প্রবেশ করে ষষ্ঠ বর্ষীয় পুত্র সমরনাথ

সমর। বাবা! (ভোলানাথ হেসে ফিরে চান) বাবা! বিচারক মানে কী ?

ভোলানাথ নিকেলের পকেট ঘড়ি দেখে উদ্বিগ্ন হ'য়ে খাতা গুছোতে থাকে। সমর এসে তার গলা জড়িয়ে ধরে

ভোলা। হুঁম্!

সমর। বিচারক মানে কি বাবা?

ভোলানাথ হাতের কাজ ভুলে ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুমো খায়। ছেলেকে সামনে বসিয়ে দিয়ে

ভোলা। হুঁম্! বিচারক! হুঁম্! বিচারক মানে হাকিম।

সমর। হাকিম কি বাবা?

ভোলা। (বিব্রত হয়) হুঁম্! হাকিম বলি তাকে, যে হুকুম করবার ক্ষমতা পায়। হুকুম সেই করতে পারে, হুকুম ন্যায়ত জারি করবার অধিকার আছে যার। সে কে -- না বিচারক।

সমর পিতার একটি বর্ণও বোঝে না, নিঃশব্দে শুধু পিতার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ভোলানাথ আপন ব্যাখ্যায় হেসে উঠে

সমর। আমি হাকিম হব বাবা।

ভোলা মাষ্টার অপুর্ব উদ্দীপনায় দুলে উঠে। সে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়

ভোলা। হাকিম তুইতো হবি। এ-গাঁয়ে যা কেউ হয়নি, সেই হাকিম তুইই তো হবি খোকা। তুই আমার রূপকথার রাজপুত্র। জন্ম তোর পাতালপুরীর লোহার কবাট ভেঙ্গে, আম্বি বুড়ীর গোপন কৌটার পরশ কাঠি আনতে। সেতো তোকেই আনতে হবে খোকা।

সমর। কৈ বিচারক বললেনা বাবা?

ভোলা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিচারক। বিচারক কথা এল কোথা থেকে? বিচারের দণ্ড যার হাতে, সেই উত্তম পুরুষকেই বলা হয় বিচারক। এখন বিচার কী? বিচারের প্রশ্ন উঠলেই মনে জাগে আচারের কথা। এখন আচার—

সমর। আচার আমি খাব বাবা।

ভোলা। ওরে অবোধ, এ আচার সে আচার নয়। এ আচার সেই আচার যা সমাজ মনীষী সৃষ্টি করলে মানব প্রবৃত্তিকে দমন করতে। হুঁম্!

তিনি চকিতে নাকে চশমা এঁটে পশ্চাতে দুই হাত নিবদ্ধ করে দাঁড়ান

সেই প্রবৃত্তিকে তাঁরা ভাগ করলেন দুভাগে। একের নাম দিলেন ন্যায়, অপরটির নাম দিলেন অন্যায়। ন্যায়কে বলেন সৎ, অন্যায়কে ফেললেন অসতের কোঠায়।

দরজায় এসে দাঁড়ান কৃপাময়ী, চোখে ভর্ৎসনার জ্যোতি। তিনি থমকে দাঁড়ান এ দৃশ্যে গালে হাত দিয়ে

পশ্চাতে এসে দাঁড়ান ছোট-বৌ। হঠাৎ ঘরে ভোলা মাষ্টারকে দেখে মাথায় ঘোমটা টেনে দেন

কৃপা। ওমা! বলতো ছোট-বৌ, আমি এই দুই পাগলকে নিয়ে কী করি? কোথায় ওঁর ইস্কুলের বেলা হ'ল—

ভোলা। এই ন্যায় এবং অন্যায়ের কোঠা বজায় ক'রে চলবার সদর-রাস্তাই হ'ল আচার। সেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসল পাহারাওয়ালা। সে হল ন্যায়ের কোঠা বাড়ীর তক্‌মাধারী খানসামা। সে অন্যায়ের পথে বিচরণ-কারীকে বলে—ওপথ যাবার সোজা পথ নয়। এই পথই হ'ল মোক্ষধামের।

সমর। পাহারাওয়ালা কী করে?

সমর ভাবুকের মত গালে হাত দিয়ে অবাক হ'য়ে শোনে।
কী ভেবে সমর বলে উঠে

ভোলা। পাহারাওয়ালা বড় জবরদোস্ত। তার পাক্-পেয়াদা কত। সে তার অনুচরদের বলে দেয়—ওপথে যে যাবে তাকে ধরে আন, আমি সাজা দেব।

সমর। কেন সাজা দেবে?

ভোলা। ন্যায়েব পথ ছেড়ে কেন সে যাবে নিষিদ্ধ-পথে? অন্যায়—

সমর। অন্যায় কী বাবা?

ভোলা। মিথ্যে কথা বলা, চুরি করা। ন্যায়ের পথে মানুষ মেরে ফেলে—

সমর। আমিও ত মেরে ফেলি।

ভোলা। তুমিও অন্যায় কর।

সমর। সেদিন, দুটো পিঁপড়ে আমার দুধের বাটিতে পড়েছিল। মা মেরে ফেল্লে। মা বলে, পিঁপড়ে খেলে সাঁতার শেখে। আমি খাইনি। বললাম, সাঁতারও শিখবনা পিঁপড়েও খাবনা।

ভোলানাথ পুনরায় খাতা গুছতে থাকেন

কৃপা। দেখ্‌ ছোট-বৌ, মুখে কি ওর কিছু বাধেনা?

ছোট। ভগবান করুন, ও বেঁচে থাক। আমি বলছি দিদি, ওছেলে দৈত্য-সংহারী প্রহ্লাদ। তোমার সংসারের দৈন্যরূপী দৈত্যকেই বিনাশ করতে বুঝি ওর জন্ম।

সমর। বাবা!

ভোলা। কি বাবা!

সমর। বিচারক অন্যায় করলে কী করে?

ভোলা। সাজা দেয়। সে বলে তুমি অন্যায় করেছ, আচারের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তুমি করেছ অপরাধ—আমার বিচারে তুমি পাবে সাজা। সে পক্ষপাতিত্ব করে না। সে বলে, আমার হাতে ওজনের মাপকাঠি, নিক্তির ওজনে হয় বিচার চুল চিরে। সে কাউকে ছাড়েনা।

সমর। তোমাকেও না?

ভোলা। আমাকেও না।

সমর। বারে, তুমি যে বাবা!

ভোলা। বিচারকের বিচারে অপরাধী কারুরই নেই নিস্তার। বিচারকের হাতে ন্যায়ের দণ্ড। তাইতো তার বিচারে—বাপ, ছেলে, মা, কারুরই নেই মুক্তি।

সমর। তবেতো তোমাকেও সাজা নিতে হয় বাবা।

ভোলা। কে দেবে সাজা বাবা।

সমর। আমি। এই যে বললে আমি বিচারক।

ভোলানাথ ঘুলিয়ে ওঠা চোখে পুত্রের মুখচুম্বন করে তাকে বুকে তুলে নেয়। বসিয়ে দেয় তাকে তক্তাপোষের ওপর—
বিচারকের উঁচু আসনে

ভোলা। আমার বিচারক! আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক! —আমার বিচারক!

সমর খুশিতে হেসে ওঠে খিল খিল করে। ভোলানাথ ভয়ে জড়সড়
হাতজোড় করে মাটিতে বসে

হুজুর! আমি অপরাধী। তোমার পেয়াদা এনেছে ধরে। আমার অন্যায়ের বিচার তুমি কর। তার পূর্বে,আমার অন্যায়টা কী জানতে পারি?

সমর। বেন্দাকাকার ছেলে—আকু আমার ভাই। তুমি তাকে মেরেছ। সে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী গেছে।

ভোলা। এ কথা আমি মানি।

সমর। মা বলে, কাউকে মারতে নেই। সে ব্যথা পায়। তুমি কেন মেরেছ বাবা? সে যে ব্যথা পেলে।

ভোলা। হুজুর! আমি তাকে ব্যথা দিয়েছি, অতএব অপরাধী। আমার এ অন্যায়ের সাজা দিন।

সমর। বাবা, ফাঁসী মানে কি?

ভোলানাথ উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়

ভোলা। হুঁম্! ফাঁসী? ফাঁসী অপরাধীর চরম দণ্ড। ফাঁসী মানে প্রাণ দণ্ড। জীবন্তে যে জীবন নেয়, ন্যায়ের বিচারে তারও প্রাণনাশের প্রয়োজন হয়। হত্যার চেয়ে নৃশংস অপরাধ যেমন নেই, তেমনি ফাঁসীর চেয়ে চরম-দণ্ডও আর নেই। বিচারকের তূণে বিচারকের ব্রহ্মাস্ত্র।

সমর। আমি তোমাকে সাজা দেব।

ভোলানাথ পুনরায় মাটিতে হাত জোড় করে বসে। কৃপার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠে এক অনাগত অমঙ্গলের আশঙ্কায়

ভোলা। হুজুর, আমি প্রস্তুত, আপনি সাজা দিন।

সমর। বাবা, তোমায় আমি ফাঁসী দিলাম।

কৃপা। (আর্তকণ্ঠে) খোকা!

ভোলানাথ অবরুদ্ধ উচ্ছ্বাস গোপন করতে পারেনা। সমর কৌতুকে হেসে উঠে। কৃপা প্রবেশ করেন

ছি বাবা! ও কথা বলতে নেই। উনি যে গুরু, সকল গুরুর বড় গুরু, সকল দেবতার ঈশ্বর।

চোখের জল মোছেন আঁচলে। ছোট-বৌ ছুটে যেয়ে সমরকে তুলে নেয় কোলে

বৃন্দাবন। (নেপথ্যে) মাষ্টারমশায়!

কৃপা সাতঙ্কে ফিরে চায়। ভোলানাথ চকিতে উঠে দাঁড়ায়। তার সর্বাঙ্গ ক্রোধে ফুলে উঠে

ভোলা। কে!

বৃন্দাবন দরজায় এসে দাঁড়ায়

বৃন্দা। আমি বৃন্দাবন।

ভোলা। (কঠিন কণ্ঠে) কিছুতেই না। আমি ভোলা মাষ্টার, অন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব কোনদিন করিনি—আজও করব না।

বৃন্দা। বামুন বর্ণশ্রেষ্ঠ—তাই, বউটা পাঠিয়েছিল নতুন গাছের দুছড়া কলা। আপনি নাকি তা নেননি, আর মেরেছেন ছেলেটাকে থাম্‌কা?

ভোলা। অতবড় মানী লোক যতীশের বাপ যা পারলেনা, জমিদার দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী বৌ-গিন্নী যা পারলেনা, সেই অকাজ তুই আমাকে দিয়ে করিয়ে নিবি বৃন্দাবন! আমি মারি থাম্‌কা! ভোলা মাষ্টারের আর যে দোষ থাক, থাম্‌কা আমি পরের ছেলেকেও মারিনা, নিজের ছেলেকেও না।

বৃন্দা। আপনি বলেন, আমরা চাষার ছেলে হাকিম হ'তে ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাই। সেই অপরাধেই সে পাবে শূন্য। এ আর বুঝিনে—হিংসে।

ভোলা। এ তোর যোগ্য কথাই বল্লি বৃন্দাবন। তোর মনে পড়ে কিনা জানি না, একদিন তোকে মেরেছিলাম—যেদিন ইস্কুলের বুড়ো আমগাছটার আগ্‌ডালে উঠেছিলি—যেখানে কোন লোভেই অতি লোভীও ওঠে না;—তুই উঠেছিলি পাখী ধরতে। পাখী ধরা দিলেনা, উড়ে গেল তোর নাগালের বাইরে। তুই রেগে আছড়ে ফেল্লি সেই ওপর থেকে পাখীর একটি মাত্র ছানাকে। আজও দেখছি তুই সেই রুদ্র-ভৈরবের তাল বেতালেরই একজন আছিস্‌।

কৃপা। ছি বৃন্দাবন! উনি না তোমার গুরু!

বৃন্দা। গরু কেনাবার গুরুভার আরোপ করলে গুরু বলিনা। মানুষকে গোময় স্পর্শে উদ্ধার করলেই গুরু বলে মানি।

সে হন্‌ হন্‌ করে বেরিয়ে যায়। ভোলানাথ বিমুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকে

ভোলা। জান গিন্নী, আমার বৃন্দাবন যেন তার দশবছরের কোঠাতেই আছে। একটুও বাড়েনি। ও তেমনি আছে, একটুও বদ্‌লায়নি। নিষ্ঠুরতায় কী অবিচল ওর নিষ্ঠা।

কৃপা। (চোখ মুছে) ইস্কুলে যাবেনা?

ভোলা। ইস্‌! সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আজ আর আমার খাওয়া হ'লনা গিন্নী বেলা হ'য়ে গেছে, বেলা হ'য়ে গেছে। আমার চাদর দেও, আমি চল্লাম।

সে দড়ি থেকে চাদরখানা টেনে নিয়ে ছোটে

দৃশ্য—ইস্কুল হলের ইঙ্গিত-গর্ভ দৃশ্য

ইস্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠে। ছেলেদের নেপথ্য কোলাহল স্তব্ধ হয়। হেডমাষ্টার মহাশয় শান্ত সৌম্য মূর্তিতে এসে হলের মধ্যভাগে দাঁড়ান।

হেডমাষ্টার। ও! এই যে তোমরা সব এসেছ। বস-বস! আজ আমার আনন্দের দিন। শুধু আমার নয়, এই ইস্কুলের, এই গ্রামের, সমগ্র বাঙলা দেশের গৌরব অর্জন করেছে সমরচন্দ্র। প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে, সমগ্র বাঙলার জনমতের সম্মুখে এই ইস্কুলের সমস্ত শিক্ষকের গৌরবকে দেদীপ্যমান করেছে। আমি আজ ধন্য সমরচন্দ্রের শিক্ষকরূপে। আমরা মাষ্টার,ছাত্রের গৌরবেই আমাদের গৌরব। কর্মী পিতার কৃতী সন্তান সমর। সমস্ত আনন্দ উদ্দীপনার মধ্যেও আমার মন আজ ভারাক্রান্ত। তোমরা চলে যাবে সেইটাই আমার কাছে বড় কথা। সুদীর্ঘ বৎসরের ঘনিষ্ঠতায়, কতনা স্নেহ, কতনা সম্প্রীতি, কতনা মায়া! এ যেন এক বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের অঙ্গচ্ছেদ! সন্তান বড় হবার ইঙ্গিত পেয়েই না, মায়ের কোল ছাড়ে। মায়ের কোল ছেড়ে সন্তান নেমে আসে গৃহাঙ্গনে। সে বিপুল হ'তে থাকে, সে মুক্তি নিয়ে ছুটে যায় পথে। সেই দিনই তার পথ-যাত্রা সুরু হয়। আজ প্রবেশিকা পরীক্ষার তোরণ-পথে তোমরা ইস্কুলের পাঠ সাঙ্গ ক'রে, চলেছ বৃহত্তর জীবনের তীর্থ পথে। একটা কথা আজ তোমাদের বলব যা সকলকেই মনে রাখতে হবে। আত্মার বিকাশই সাধনার লক্ষ্য। যে-আত্মা এতদিন আত্মস্থ ছিল আপনার মধ্যে, তাকেই বিকাশ করতে হবে বিশ্বের নানা রূপ ও রসের মধ্য দিয়ে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমরা দীর্ঘজীবি হও, মানুষ হও, তোমাদের উদয়-পথ মেঘ নির্মুক্ত হ'ক। বিদায়!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দৃশ্য—ভোলা মাষ্টারের গৃহাঙ্গণ ও দাওয়া

অপরাহ্ন

শুধু মেজেতে পা ছড়িয়ে বসে আছেন কৃপাময়ী। একপাশে ছোট-বৌ। প্রবেশ করেন মিত্তির-জা ওরফে সিন্ধুর-মা ও বৌ-গিন্নী। বৌ-গিন্নীর বয়স ষাটের কাছে। সিন্ধুর-মা দু'চার বছরের ছোট হবে

বৌ-গিন্নী। দেখলি সিন্ধুর মা, বলেছিলাম ছোট-বৌকেও বড়-বৌএর পাশেই পাবি। সম্‌রা নাকি এণ্টেস্‌ পাশ দিয়েছে বড়-বৌ? তা বেশ হ'য়েছে—বেঁচে বর্তে থাক। মানুষ হ'ক গোপীনাথের কাছে প্রার্থনা করি।

ছোট-বৌ। শুধু পাশই করেনি দিদি, ফার্ষ্ট'ও হ'য়েছে।

বৌ-গিন্নী। নে বাপু, তোদের ইঞ্জিল মিঞ্জিল বুঝিনা। সোজা বাংলায় বুঝিয়ে বলিস তো বুঝি।

সিন্ধুর-মা। ফাষ্টো মানে জাননা দিদি?

বৌ-গিন্নী। কী করে জানব বল সিন্ধুর-মা। বে' হয়ে শ্বশুর-ঘর করতে এসেছি আটবছর বয়সে। সেই থেকে শ্বশুর-ঘরে বাংলা চালেই মানুষ হ'লাম। না ছিল বাপ মায়ের ঘরে ও পাঠ, না আছে শ্বশুর ঘরে ইংরেজী চাল। ঘরে এলেন লক্ষ্মী, সরস্বতী বাদ সাধলেন—লেখা পড়া ওঁর পাঠশালেই হ'ল সাঙ্গ। আর এগুলনা। বিলেতি সরস্বতীর পায়ের দাগও এ আঙ্গিনায় পড়লনা। শ্বশুর বললেন—বিলিতি পাপ এলনা—বাঁচলাম। এখন—যে জানিস মানেটা বল্‌!

সিন্ধুর-মা। (হেসে) ফাষ্টো মানে প্রথম।

বৌ-গিন্নী। সে আবার কী?

সিন্ধুর-মার বিদ্যা ঐখানেই হয় সাঙ্গ। ছোট-বৌ বলে

ছোট-বৌ। প্রথম অর্থাৎ সবার ওপরে হ'য়েছে স্থান। হাজারো ছেলে পরীক্ষায় বসে সারা বাংলা দেশের বুক জুড়ে। সমর বাজি জিতলে। দেবীর বর সেই পেলে।

বৌ-গিন্নী। বাজিতো জিতলে, হ'লও প্রথম। কী বর দেবীর এল ?

ছোট-বৌ। দুবছরের বরাদ্দে মাসিক বিশটাকা জলপানি।

বৌ-গিন্নী। বারে সমর! অমন মুখচোরা ছেলে, এ সব করতে পারলে কী ক'রে ? তা বেশ হয়েছে। কেমন সিন্ধুর-মা বলেছিলাম কিনা যে, অমন বাপের ছেলে সে অমন পাশ দেবেই। বিদ্যের পাশুপত-অস্ত্র যে ওর বাপের হাতে।

সিন্ধুর-মা। এখন কী করবে স্থির করেছে ?

কৃপা। উনিতো বায়না ধরেছেন, ওকে পড়াবেন।

সিন্ধুর-মা। সে কি সহজ কথা বৌ। আমাদের উনি কমতি কিছুই নেই, সেই তিনিই হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছেন ছেলেদের পড়াতে। এতো আর গাঁয়ের ইস্কুল নয় যে, ঘরের খেয়ে ইস্কুলে যাবে। এবার পাঠাতে হবে কলকাতায়।

কৃপা। উনি বলেন, ওকে কলকাতাতেই পাঠাবেন।

সিন্ধুর-মা। বলিস কিলা বড়-বৌ! কলকাতায় পড়াতে সঙ্গতি চাই।

কৃপা। আমিও তো তাই বলি। কলকাতায় পাঠাই সে সংস্থান কোথায় ? ওঁর হরধনুভঙ্গের পণ। ধনুক না ভাঙ্গলে পণ নড়বে না। বলেন, ভিক্ষে করেও যদি ছেলেকে পড়াতে হয়, তিনি তাও করবেন।

বৌ-গিন্নী। কাজ কী অত হাঙ্গামায় বড়-বৌ। এক কাজ কর্। মাষ্টারকে বল্ ওঁকে যেয়ে ধরুক। এই ইস্কুলেই একটা কাজ নিয়ে গাঁয়ের ছেলে গাঁয়েতেই থাকুক।

ছোট-বৌ। গাঁয়ের গণ্ডী না কাটালে যে, সুখের রাজ্যে রথ পৌঁছয় না দিদি।

বৌ-গিন্নী। রাথ্ বাপু তোর রথযাত্রা। গণ্ডীর বাধা সীতা কাটালে বলেই না এল ভাঙন-পথে দুখের রাবণ! ও বাপু কিছু কাজের কথা নয়। সব ছেলেই যদি গাঁ ছাড়তে সপ্ত-ডিঙ্গায় পাল খাটায়, তবে গাঁয়ের দশা কী হয়? না না বৌ, ছোট-বৌ এর কথায় ভুলিসনে। সমরার বাপকে বল্ বুঝিয়ে, এই গাঁয়েই থাকুক ও একটা কাজ নিযে।

গাঁয়ের বৈষ্ণবী ভিখারিণী হরিমতি। নেপথ্যে হাঁকে

হরি। হরি বল মন। কৈ গো বৌঠান কোথায় গেলে?

বৌ-গিন্নী। আয়লো হরি!

হরি এসে দাঁড়ায় অঙ্গনে

হরি। এ যে দেখি অষ্টবজ্রের সম্মিলন!

কৃপা। আয় বোস্।

হরিমতি অঙ্গনে ঝোলা নামিয়ে এসে বসে

হরি। বৌঠান, ছেলে পাশ দিয়েছে—একখানা কর্তামশায়ের পুরনো কাপড় না নিযে উঠ্ছিনে। এই সেবার সিন্ধুর ভাই মিত্তির-মশায়ের ছেলে রমেনবাবু পাশ দিলে, সিন্ধুর-মার কাছে একখানা নতুন কাপড় আদায় করলাম।

সিন্ধুর-মা। কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা। সেকি যেমন তেমন পাশ! কর্তার সেবারে খুব কম করেও শ'পাঁচেক টাকা খরচা হ'ল। গাঁয়ের লোক চোব্যচূষ্যত খেলেই, আর খেলে কলকাতায় রমেনের বন্ধু-বান্ধব সাহেব হোটেলে।

বৌ-গিন্নী। নে বাপু, এ কিন্তু তোর বাড়াবাড়ি। কেন, আমার অমরনাথ শিবনাথও ত পাশ দিয়েছে, কৈ কাউকেতো খাওয়ায়নি। উনি বলেন, বাপের পয়সায় অমন সবাই চোব্যচূষ্য চালায়। রোজগার ক'রে করে, তারেই বলি বাহাদুর! নে লো হরি! যখন এলি, তখন হরির মুখে একখানা হরির নাম শুনিয়ে দে। শুনে বাড়ী যাই, বেলাও পড়ে এল।

হরি গান আরম্ভ করে

গীত

গান :— আহা, গোচারণে গেছে ব্রজের গোপাল
এখন ফেরেনি ঘরে।
ভাবিয়া ভাবিয়া রাণী যশোমতী
কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরে ॥
(কেঁদে মরে। আহা, যশোদা জননী কেঁদে মরে।)
বেলা যত বাড়ে, ছায়া যত পড়ে
রাণী ভেবে ভেবে তত মরে।
রাণী ঘর ও বাহির করে ॥
(কেঁদে মরে।)

কথা :—সন্ধ্যা হ'য়ে আসে, তবুও গোপাল ফেরে না ঘরে। জননীর প্রাণ ওঠে কেঁপে, ওঠে কেঁদে অব্যক্ত বেদনায়। মায়ের মন মানে না প্রবোধ, ডাকে,—গোপাল ! গোপাল ! গোপাল ! বৃন্দাবনচন্দ্রের বিহনে যে দশদিশি তাঁর অন্ধকার।

গান :— নিজের ছায়ারে কৃষ্ণ ভাবিয়া কৃষ্ণের জননী
বলে,—ফিরে এলি কিরে গোপাল আমার নয়নের নীলমণি !
এলি না রে !
গোপাল আমার ফিরে এলি না রে !
কেন লুকায়ে রহিলি ছলনা করে
কাঁদাইতে আমারে !
পরাণ পাখী না পেয়ে আহা, অঝোরে আঁখি ঝরে।
রাণীর পরাণ কাঁপে ডরে।

কথা :—কাঙালের ঠাকুর গোপাল। জননীর অঞ্চলের নিধি গোপাল। আসে ফিরে। কোন দীনতাই যে সইতে পারে না দীনবন্ধু। দীনা জননীর ব্যথা নিজের বুকে তুলে নিয়ে গোপাল মায়ের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গান ঃ— শীতল হল দগধ চিত,
রাণীর শীতল হল,—
গোপাল এল ঘর।
মা যে বসায়ে কোলে, চাঁদ মুখে দিল তুলে
ক্ষীর ননী সর ॥

কৃপাময়ী গীতান্তে ঘরে উঠে গিয়ে একখানা স্বামীর থান এনে হরির হাতে দেন

হরি। তোমার ঘরে মা-লক্ষ্মী অচঞ্চলা হন। তোমার ছেলে দশের একজন হ'ক। গাঁয়ের মুখ উজ্জ্বল করুক—এই কামনা করি।

বৌ-গিন্নী। ওলো বড়-বৌ, বেলা গেল আমি উঠি। (তিনি উঠে দাঁড়ান) কি লা সিন্ধুর-মা, উঠবি না থাকবি ?

সিন্ধুর-মা উঠে দাঁড়ান

সিন্ধুর-মা। যাবনাতো কি থাকব ?

বৌ-গিন্নী। যা বললাম বৌ, মনে রাখিস। কর্তাকে গিয়ে আমি এখুনি বলছি। সন্ধ্যার পর মাষ্টারকে একবার যেতে বলিস্। এইখানেই কাজ হয়তো, ঘরের ছেলে বাইরে যাবে কোন লোভে ? চল্‌লো সিন্ধুর-মা।

তিনি বেরিয়ে যান

সিন্ধুর-মা। ওলো তিলক ছাপা, কাল একবার যাস্। নরেনের ছেলের পাশের একখানা নতুন কাপড় দেব।

হরি। নিশ্চয় যাব মা—নিশ্চয় যাব। তোমাদের পাঁচজনের দয়াতেই তো আছি। নইলে আমার আর ভোমরা ছাড়া আর কে আছে বল ! প্রণাম গো বৌ-গিন্নী—প্রণাম সিন্ধুর-মা। (সিন্ধুর-মা বেরিয়ে যান) গাঁয়ের পথে ঘাটে তোমার ছেলের নাম বৌঠান। লোকে বলছে যে-পাশ নাকি করেছে দাদাঠাকুর, সে-পাশ নাকি সাত-রাজ্যের লোক পারেনা। চললাম বৌঠানেরা, প্রণাম হই।

সে প্রণাম করে ঝোলা তুলে

কৃপা। আবার আসিস্!

হরি। আসবো বই কি বৌ-ঠান।

সে চলে যায়

কৃপা। জানিস্ ছোট-বৌ, আমার একটি সাধ—

ছোট-বৌ। কী দিদি?

কৃপা। তোর রাধাকে আমায় দিস্।

ছোট-বৌ। সে কি কথা দিদি! ও তো তোমারই, আমার হ'ল কবে? তোমায় ছেড়ে এক-দণ্ড থাকেনা। রাতে যেটুকু ঘরে থাকে, তোমারই নাম মুখে। উনি বলেন, ও-বাড়ীর পোষা মিনিকে এ-বাড়ীতে এনে বাঁধলে থাকবে কেন? ও-বাড়ীতে ওর মুক্তি, এ-বাড়ীতে বন্ধন। তুমি যদি নেও দিদি, তবেতো ও বাঁচে।

কৃপা। তোকে কথা দিলাম ছোট-বৌ, ভগবান যদি দিন দেন তবে সমুর জন্তেই ওকে নেব।

ছোট-বৌ। তার কি সত্যিই সে ভাগ্য হবে দিদি।

ভোলা। (নেপথ্যে) গিন্নী! গিন্নী!

ছোট-বৌ। বড়ঠাকুর আসছেন, আমি এখন যাই দিদি।

ছোট-বৌ মাথায় ঘোমটা টেনে বেরিয়ে যায়

কৃপা। পালাস নি লো, তোর সঙ্গে কথা আছে।

প্রবেশ করেন ভোলানাথ, গায়ের চাদর দড়িতে ফেলতে ফেলতে

ভোলা। আজ রাতেই যাচ্ছি, তুমি তার আয়োজন কর।

কৃপা। কী যে বল! বলা নেই কওয়া নেই অমনি চললে। কেন বলতো?

ভোলা। (বিস্মিত চোখে) কেন! হতভাগিনী, শোননি কি যে ভাগ্যলক্ষ্মী তোমার 'পরে প্রসন্না হয়েছেন। অয়ি রত্নগর্ভে!

কৃপা। (নিম্নস্বরে) ওদিকে ছোট-বৌ রয়েছে না ?

ভোলা। তাকেই তো শুনিয়ে বলছি। তোমাদের অঙ্কনিধি যে আজ অতুল সম্মান অর্জন করতে চলেছে। বিজয়ীবীর দিগ্‌বিজয়ে বেরুবে, আমি অগ্রগামী পদাতিক চলেছি সেই মহা-যজ্ঞেরই আয়োজনে।

কৃপা। আপাতত অগ্রগামী পদাতিক এগুবেন কোন দিকে ?

ভোলা। কলকাতার পথে।

কৃপা। কলকাতায়! কেন ?

ভোলা। সমু যে কলকাতায় পড়তে যাবে তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে না!

কৃপা। বৌ-গিন্নী এসেছিলেন। তিনি বলছিলেন, সমুর কলকাতায় যেয়ে কাজ নেই। গাঁয়ের ছেলে গাঁয়ে থাকুক ইস্কুলেরই একটা কাজ নিয়ে। তিনি বলেন, অমন ছেলের গাঁয়েরও প্রয়োজন আছে।

ভোলা। ভূগোল-বিবরণে গাঁই দেশ নয়। দেশ শত-গ্রামের সমষ্টি। সেই দেশের কল্যাণেই তাকে এই গাঁয়ের মায়া কাটাতে হবে। আমার সমুতো ঘরের কোণের প্রদীপ শিখা নয়, সে যে প্রলয়ের আগুন। তার শিখা ঘরের চালাকেও ডিঙিয়ে উঠে ঊর্ধ্বে। তার সেই দীপ্তি শুধু এই গাঁকেই উজ্জ্বল করবে না—করবে সমস্ত দেশকে। দেশের ও দশের গর্ব খর্ব করি, আমার সাধ্য কী! গিন্নী, তুমি আমার যাবারই আয়োজন কর। আমি যাবই।

কৃপা। আমি অত কথা বুঝিনা। বুঝি এই যে, তোমার সামর্থ আসছে কমে—বয়সও বাড়ছে। সমু যদি গাঁযে থেকে এখন থেকে রোজগার করে, তোমারও বিরাম—ঘরেরও সাশ্রয়। কর্তাবাবুকে বলে ওকে ইস্কুলেরই একটা মাষ্টারি জুটিয়ে দেও।

ভোলা। (কোপ সহকারে) মানুষ বড় হবার প্রবৃত্তি পায় অহংকারে। সেই অহংকারের সম্পদ আমার অন্তরের রত্নশালায়। যার এই

অহং-সম্পদ নেই, সে স্রোতের শ্যাওলা। স্রোতের মুখে সে ভেসে চলে ইতস্তত, পথের নিরীখ তার নেই। সেই গতানুগতিক-পথে আমার খোকা যাবে না। স্বপ্ন-লোকের মানস-ফুল কোন গোপন-লোকের কুঞ্জে ফোটে, তাকেই আনবে সে ছিনিয়ে।

কৃপা। মানস-ফুলই সে আনবে ছিনিয়ে মানি, কিন্তু স্বপ্ন-লোকে যাবার পাথেয় জোগাবে কে ?

ভোলা। সেই দুর্লভের সন্ধানেই আজ আমার অভিযান। সমুকে হাকিম করতে যদি নিজেকে বিক্রী করতে হয়, তাও আমি করব। কোন ত্যাগই আজ আমার বড় নয়. কোন হীনতাই হীনতা নয়, যা আমি বরণ করতে কুণ্ঠিত আমার ছেলেকে দশের একজন করতে। তুমি জেনে রাখ, সমু আমার হাকিম হবেই।

কৃপা। খোকার থাকবারই বা কী হবে, চলবেই বা কী করে ?

ভোলা। ওকি যে সে ছেলে! দশটা কলেজ থেকে হেডমাষ্টার মশায়ের কাছে এসেছে আবেদন তাদের কলেজে নেবার জন্যে। যতীশ আমার ছাত্র, তার বাড়ীতে খোকাকে রাখতে চাইলে, নিশ্চয়ই সে আপত্তি করবে না। পাবে কলেজের বেতন মাপ আর মাসিক বিশটাকা জলপানি।

কৃপা। তাতে কলকাতার খরচা না হয় সঙ্কুলান হ'ল। ছেলেকে হাকিম করতে শুদ্ধ বিশ টাকা জলপানিতেই হয় না। শুনেছি, হাকিম হ'তে বিলেতে যেতে হয়। অনেক টাকা খরচা। শুধু তাই নয়, সেখানে গেলে নাকি অখাদ্য কুখাদ্যও খেতে হয়। সমাজের কথাও তো ভাবতে হবে।

ভোলা। আজ সেই দুর্লভের প্রত্যাশাতেই হবে আমার তপস্যা শুরু। সবার বিরুদ্ধে আমি বুক ফুলিয়ে দাঁড়াব। যদি একলা পথেরই পথিক আমাকে হ'তে হয়, জানব সে সত্যের পথ।

কৃপা। কী যে বল।

ভোলা। কেন!

কৃপা। ছেলেকে হাকিম করতে, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, দেশ, সমাজ সব ত্যাগ করবে?

ভোলা। কোন আত্মীয়ই আত্মীয় নয়, কোন সমাজই আমার সমাজ নয়, যারা আমার ছেলেকে মানুষ করবার পথে প্রতিবন্ধক হবে। জান গিন্নী, লোকে আমাকে পাগল ভাবে। তারা প্রকাশ্যেই বলছে—ওরে, ভোলা মাষ্টার ক্ষেপে গেছে। আমি জানি ওদের, সেদিনও ওরা অমনিই বলেছিল, যেদিন গাঁয়ে প্রথম ইস্কুল বসালাম। তাদের কথা নেই। কিন্তু ইস্কুল আজও সত্য হ'য়ে আছে।

নেপথ্যে হেডমাষ্টারের কণ্ঠ শোনা যায়

হেড। (নেপথ্যে) সময় আছ?

কৃপা। বোধ করি হেডমাষ্টার মশায়, আমি যাই।

কৃপার প্রস্থান। প্রবেশ করে হেডমাষ্টার

ভোলা। প্রেসিডেন্সিতেই ভর্তি করব ভাবছি। যতীশেরও মত নেব।

হেড। থাকবার ব্যবস্থাও বুঝি ওইখানেই করবেন?

ভোলা। যতীশের বাড়ীতে রাখতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই। যতীশ ভাল ছেলে, আমার ছেলেকে রাখবার অমত সে কখনই করবে না।

হেড। অমন ছেলে দেশের মুখোজ্জ্বল করে। ক'টা ইস্কুলের এমন সৌভাগ্য হয় যে, তার ছেলে প্রথম স্থান অধিকার করে। শুধু তারই নাম নয়, এই ইস্কুলের সকল শিক্ষকের গৌরবকে দেদিপ্যমান করেছে সমস্ত বাংলার জনমতের সম্মুখে। একটা কাজের কথা বলতে এলাম।

ভোলা। বলুন।

হেড। এইমাত্র জমিদারবাবুর ওখান থেকে আসছি।

ভোলা। (বিদ্রোহীর অবাধ্যতায়) না না, আমি কোন কথা শুনব না।

আমার ছেলে, তার ভালমন্দ আমি বুঝব। পরের কথায় আমি তার সর্বনাশ হ'তে দেব না। বড় হবার প্রেরণা নিয়ে যে জন্মেছে, তাকে ছোট করব কোন সুখে? দারিদ্র! দারিদ্র ত আছেই। তার চাতুরীর ফাঁদে পা বাড়ালে চলবে না। কত বড়, কত মহৎ হবার প্রেরণা নিয়ে জন্ম নিলে কত হতভাগ্য, শেষে ঐ ফাঁদেই ধরা পড়ল। দৈত্যপুরীর দেয়াল ডিঙিয়েই আনতে হয় বন্দী-লক্ষ্মীকে উদ্ধার ক'রে। তাকেই সত্য বলে মেনে নিলে তো কেউ বড় হবে না এদেশে। তার সঙ্গেই যুঝতে হবে, লড়াই করে তাকে পদানত করতে হবে।

হেড। আপনি ভুল করছেন। সে-কথা আমি বলিনি। সত্যেরই জয় হ'ক, এই কামনা করি।

ভোলা। সত্যের যিনি আগুন-দেবতা তিনিই পরিয়েছেন ওর কপালে জয়ের তিলক। সে জয়ের পর জয়ের মাল্য অধিকার করে পৌঁছবে তার লক্ষ্যস্থলে।

হেড। কোন লোভেই আমিও তার গতি রুখতে চাই না ভোলানাথ-বাবু। আমিতো চাইই না, দীনবন্ধুবাবুও চান না। বরং তাঁকে উৎসাহিতই মনে হ'ল। তাঁর গাঁয়ের একটি ছেলেও আজ গ্রামের গণ্ডি পেরিয়ে দেশ-মান্য হ'তে চলেছে।

ভোলা। এই কথা তিনি বললেন হেডমাষ্টার মশায়? তবে আমায় মাপ করুন—আমি হঠাৎ উত্তেজনায়—

হেড। আপনার মনের অবস্থার সন্ধান আমি রাখি, তাই একথায় আমি গৌরবই অনুভব করেছি।

ভোলা। আমি বলছি মাষ্টারমশায়, ঐ ছেলে হাকিম হবে। হাকিম সে হবেই।

হেড। তাই হ'ক। তবেই নিজেকে ধন্য মানব। আমরা মাষ্টার, ছাত্রের গৌরবেই আমাদের গৌরব। নইলে আমাদের কে চেনে?

ওরাই বড় হয়—হয় দশের একজন। বৃহৎ-সভায় উঁচু আসনে বসে, আমরা সাধারণের অপরিচয়ের ভিড়ের মধ্য থেকে বলি—ঐ ত আমার ছাত্র। আজ সে বড় হ'ল কার অধ্যাপনায়? ইস্কুল মাষ্টার হারিয়ে যায় ভিড়ে। উত্তরকালে তারই মহিমা বহন করে অসংখ্য ছাত্র।

ভোলা। (স্বপ্ন ঘোরে) কেউ জানবে না, কেউ চিনবে না আমি তার বাবা। কেউ জানবে না আমারই মুখের বাণীতে তার বর্ণপরিচয়। ভূগোল-বিবরণের জ্ঞান ঐ যে ঠাসাঠাসি ওর মগজে—তার প্রথম পরিচয় হয়েছিল এই ভোলা মাষ্টারেরই গঞ্জনায়। আমি হারিয়ে যাব ঐ অসংখ্য তারার মেলায় একটি ছোট্ট-তারার মত।

হেড। একটা কথা বলতে এলাম।

ভোলা। (স্বপ্ন ভঙ্গে) হ্যাঁ হ্যাঁ, যে কথা বলতে এলেন।

হেড। আপনি তো জানেন এই ইস্কুলের একটা পাকা গাঁথুনির জন্য কত চেষ্টাই করছি। বিল্ডিং ফণ্ডে টাকাও জমেছে বড় কম নয়। হাজার পনের হবে। চুপি চুপি সেবার তাপসের বাবা—

ভোলা। কে?

হেড। ও পাড়ার তাপস, যার বাবা সেবার রুরকি থেকে এঞ্জিনিয়ার হ'য়ে এল।

ভোলা। ও হো হো হো! মনে পড়েছে। রাখুন রাখুন কত সনে? ১৩শ . ১৩শ, হ্যাঁ মনে পড়েছে—১৩১৩ সনে সে পাশ ক'রে ফিরে এল। (আপন মনে হেসে উঠে) একটা ভারী মজার কথা—

হেডমাষ্টার পকেট থেকে ঘড়ি বের করেন

ওহোহো! আমি ভুলেই গেছি যে আমাকে রাতের ট্রেনে যেতে হবে।

হেড। তাপসের বাবা—

ভোলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাপসের বাবা এঞ্জিনিয়ার—

হেড। সেবার তাকে দিয়ে একটা এষ্টিমে টুকরিয়েছিলাম। সে বললে, হাজার দশেক হ'লে বেশ একটা ইস্কুল বিল্ডিং হ'তে পারে।

ভোলা। (মহা খুশিতে) ইস্কুল বিল্ডিং এতদিনে তবে হ'ল? এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে। যেদিন জমিদারবাবুর একখানা পোড়ো-ঘর চেয়ে নিয়ে ইস্কুল বসালাম, সেদিন লোকে কী হাসাই না হাসলে। নব্‌নে পুরুতের ছেলে ইস্কুল বসালে, তার সেই ইস্কুলে পড়ে পণ্ডিত হবে যত চাষার ছেলে! তাদের কথা গেল ভেসে, ইস্কুলই রইল সত্য পাশের ঐ বুড়ো আম গাছটাকে আঁকড়ে। যারা হেসেছিল, আজ তারা নেই। কিন্তু ইস্কুল অবাধ্য ছেলের মত তাদের হাসি-ঠাট্টা উপেক্ষা করেই দাঁড়িয়ে আছে। জমিদারবাবু তাহ'লে সত্যিই এবার বিল্ডিং করবার আদেশ দিলেন?

হেড। ক'বছর ধরেই টিক্ টিক্ করছি—বিল্ডিং করতেই হবে। এইবার তিনি রাজী হ'য়েছেন। বলেন—দূর ছাই, কবে মরে যাব!

ভোলা। বিল্ডিংটা তাহ'লে আরম্ভ করে দিলেই হয়।

হেড। সেই আয়োজনই তো আপনাকে করতে হবে।

ভোলা। সেতো করতেই হবে। তাহ'লে কলকাতা থেকে ঘুরে এসেই লেগে যাব। জানেন মাষ্টারমশায়, ঐ বিল্ডিংএর সঙ্গে সঙ্গেই ওর একটা নামের তক্‌মাও লাগিয়ে দিতে হবে। অমুক গাঁয়ের ইস্কুল, একি একটা নাম! নাম আমি একটা ভেবেছি। যাঁর দাক্ষিণ্যে ধন্য এই ইস্কুল, সেই মহাশয়ের নামেই হবে এর নামকরণ। দীনবন্ধু ইনিষ্টিটিউশন—

হেড। দীনবন্ধুবাবু বলেন—ভোলানাথ ইনিষ্টিটিউশন।

ভোলা। এ্যাঁ! গিন্নী! গিন্নী!

হেড। তিনি বলেন—ইস্কুলের মা বল, বাপ বল, ঐ ভোলানাথই ওর সব। ওইতো বুক দিয়ে ওকে আশ্রয় দিয়েছে, পিঠ দিয়ে সয়েছে বর্ষণ।

ভোলা। (প্রোজ্জ্বল চোখে) এই কথা তিনি বলেছেন? গিন্নী!

গিন্নী! মাষ্টারমশায়, এই কথা জমিদারবাবু বললেন? (সে উঠে দাঁড়ায়—হঠাৎ উত্তেজনায়) গিন্নী! গিন্নী! ও গিন্নী শুনেছ। ও! নানা আমি আসছি।

সে ছুটে ঘরের দরজায় যেয়ে দাঁড়ায়

গিন্নী! এই যে—ছোট-বৌ কৈ?

কৃপা। (চাপা কণ্ঠে) এই যে রাধার-মা ঘরের ভেতর। দেখছ না?

ভোলা। না না গিন্নী, আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে।

কৃপা। কী বলতে চাও?

ভোলা। ও! ভুলে গেছি।

ভোলানাথ ফিরে আসে। সে হেডমাষ্টারের দিকে চায়—হঠাৎ মনে হয়

মনে পড়েছে—মনে পড়েছে গিন্নী। জমিদারবাবু হেডমাষ্টার মশায়কে দিয়ে বলে পাঠিয়েছেন—আমারই নামে হবে ইস্কুলের নাম। মৃত্যুর দূর পারে গিয়ে যুগান্তেও আমি থাকব বেঁচে, ঐ ইস্কুলের মহিমা মাথায় ধরে। আমি অমর—আমি অমর।

সে উন্মাদের মত হেসে উঠে। কিন্তু চোখের অজস্র ধারায় সে হাসে কি কাঁদে কিছু বোঝা যায় না। হেডমাষ্টার উঠে দাঁড়ায়

হেড। ভোলানাথবাবু! ভোলানাথবাবু!

ভোলা। (স্বপ্ন ভঙ্গে) হ্যাঁ, আয়োজন তো আমাকেই করতে হবে।

হেড। হ্যাঁ, আয়োজন তো আপনাকেই করতে হবে।

পকেট থেকে একখানা চেক বের করে

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের উপর আট হাজার চেক।

ভোলা। আট হাজার!

হেড। হ্যাঁ, অনেক কষ্টে আজ ওকে দিয়ে সই করাতে পেরেছি। এখানা ক্যাশ্ করিয়ে আপনাকেই আনতে হবে। আপনি তো জানেন, ইস্কুল ছেড়ে আমি যেতে পারি না। এ সুযোগ যদি ফস্কে যায়, তবে যে

আর কবে আসবে জানি না। এক আপনার হাতে বলেই জমিদারবাবু টাকা আনতে দিতে রাজী হ'য়েছেন। নইলে বোধ করি রাজী হতেন না।

ভোলা। কিন্তু, আট হাজার টাকাই যে কখন আমি দেখিনি।

হেড। (হেসে) আট হাজার টাকা কি একটা মোট? আটখানা কাগজ—দশ টাকার নোট আটখানা একসঙ্গে করলে যা হয়। হাজার টাকার এক একখানা নোট, আটখানা।

ভোলা। সেতো হ'ল।

হেড। জমিদারবাবুর ছোট ছেলে শিবনাথ আছে কলকাতায়, তার কাছে গেলেই সে ব্যবস্থা করে দেবে। জমিদারবাবুকে দিয়ে একখানা চিঠিও লিখিয়ে দিয়েছি।

ভোলা। ওহো হো হো! আমাদের শিবনাথ আছে, ঠিক ঠিক ঠিক। শিবনাথ আজকাল বেশ চালাক চতুর হ'য়েছে—কী বলেন? বছর দশেক আগে ওকে একদিন ক্লাসে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁরে, চন্দনপুর কোথায়? সে অনেক ভেবে মানচিত্র খুঁজে বলে— মানচিত্রে চন্দনপুর পাইনে সার। আমি বলি—ওরে মুখ্যু, চন্দনপুর যে তোর রাজত্ব। হা হা হা!

হেড। শিবনাথই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে, আমিও তাকে লিখেছি।

ভোলা। তবে তো নিশ্চিন্ত।

হেড। তা হ'লে আমি চলি। (তিনি অগ্রসর হন। ফিরে বলেন) ভাল কথা, কড়ি-বর্গার অর্ডার গুলোও প্লেস ক'রে আসবেন। সে কথাও শিবনাথকে লিখেছি।

ভোলা। তবে তো অর্ডার হ'য়েই গেছে।

হেড। কী নাগাত ফিরবেন?

ভোলা। আজ শনিবার, মঙ্গলবারে এখানে পৌঁছবই।

হেডমাষ্টার বেরিয়ে যান। ভোলানাথ স্থির হ'য়ে বসে থাকে চেকের দিকে চেয়ে। কতক্ষণ কেটে যায়, প্রবেশ করে কৃপা

কৃপা। কাগজ হাতে করে বসে কি ভাবছ ? যেতে টেতে হবে না কি ?

ভোলা। (স্বপ্ন ভঙ্গে) ও !

ভোলানাথ আবার স্থির হ'য়ে বসে

কৃপা। কটার ট্রেনে যাবে ?

ভোলা। (আপন মনে হেসে উঠে) চেক।

কৃপা। চেক কিগো ? আমি বলছি ক'টার ট্রেনে যাবে না চেক।

ভোলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, চেক। (হঠাৎ চশমা নাকে এঁটে) হুঁম্ ! চেক অর্থাৎ--

কৃপা। ওগো রক্ষ্যে কর। আমি তোমার চেকের ব্যাখ্যা চাইনি। হাতে ওখানা কিসের কাগজ ?

ভোলা। আট হাজার টাকার চেক।

কৃপা। আট হাজার টাকার চেক !

ভোলা। এইখানা দেখালে ব্যাঙ্ক আমাকে আট হাজার টাকা গুণে দেবে।

কৃপা। আট হাজার টাকা গুণে নেবে তুমি !

ভোলা। (উচ্চহাস্য ক'রে) আট হাজার টাকা কি একটা বোঝা ! হা হা হা ! আট হাজার টাকা হচ্ছে দশ টাকার আটখানা নোট একসঙ্গে করলে যা হয়।

কৃপা। কিসের ?

ভোলা। ইস্কুল ফণ্ডের টাকা। ইস্কুলের বিল্ডিং হবে কিনা।

ভোলানাথ পুনরায় অন্যমনস্ক হয়

কৃপা। তাতো হ'ল, ভাবছ কী ?

ভোলা। ভাবছি এমনি কিছু টাকা যদি পেতাম। তবে আমার

খোকার হাকিম হবার পথে কোন প্রতিবন্ধকই থাকত না। (হঠাৎ কাগজ কলম টেনে নিয়ে আঁক কষে) রাখ রাখ, হিসেবটা করে ফেলি—

কৃপা। তুমি কি ক্ষেপে উঠলে? দিনরাত কেবল ঐ হাকিম আর হাকিম। তুমি তোমার ছেলেকে হাকিম করবার ধ্যান করতে থাক, আমি যাই।

তিনি বেরিয়ে যান। ভোলানাথ চোখ বুঁজে পুনরায় ধ্যানস্থ হয়। সে ধীরে ধীরে চোখ খোলে। চোখে তার এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা

ভোলা। যদি—

হঠাৎ চমকে উঠে সে চারিদিকে চায় ভীত চোখে। চেকখানি সন্তর্পণে ভাঁজ করে সযত্নে পিরাণের পকেটে রাখে। ঘরের ভেতর থেকে আনে একটা রং করা ছোট টিনের বাক্স। বসে টিনের বাক্সের ভেতরকার জিনিষগুলো বের ক'রে স্তূপাকার করে পাশে। উঠে গিয়ে অন্য বাক্স থেকে আনে একটি খেলনা বেহালা আর ছোট্ট বাঁশের বাঁশী। কাপড় রেখে বেহালা পরীক্ষা করে। তারটি ছেঁড়া

(বিরক্ত ভাবে) তারটা ছিঁড়ে রেখেছে দেখ! কী দুরন্ত ছেলেই যে সমর! কিচ্ছু হবেনা, কিচ্ছু হবেনা, ও ছেলে হবে মুখ্যু। ওরে মুখ্যু! তোর মোটা হাতে এর সুর ফুটবে কেন?

তিনি উঠে বেহালাটাকে দেয়ালের সর্বোচ্চ তাকে তুলে রাখেন। এসে বসে বাঁশীটি পরীক্ষা করতে থাকেন। এদিকে ওদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে বাঁশীতে ফুঁ দেন। বাঁশীর শব্দে চমকে উঠেন। বাঁশী লুকোন পেছনে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দরজার দিকে চেয়ে। দরজায় এসে দাঁড়ান কৃপাময়ী

ভোলা। (অকারণে হেসে উঠেন) আমার সমুর বাঁশী।

কৃপা। ও বাঁশী তুমি কোথায় পেলে? ও যে আমি তুলে রেখেছি রাধার জন্যে।

ভোলা। কার ?

কৃপা। রাধার—আমাদের রাধার গো। ছোট-বৌএর মেয়ে।

ভোলা। (হঠাৎ উত্তেজনায়) না না—এ বাঁশী আমি কাউকে দেবনা। এ আমার—আমার।

কৃপা। (হেসে বলেন) তুমি কি সত্যিই ক্ষেপে উঠলে ? বাঁশী তুমি কী করবে ?

ভোলা। আমার সমুর বাঁশী—তার খেল্না থাকবে তার শিশু-স্মৃতিকেই স্মরণ করিয়ে। ভবিষ্যতের খোকা যখন তার বিকাশের স্বাতন্ত্র্যে দূরে সরে যাবে, এই বাঁশীই থাকবে তার শিশু-স্মৃতির বাহন হ'য়ে আমার বুকে। আমার মুখের ডাকে বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে শিশু-বাণীর জড়িমা মুখর হ'য়ে উঠবে।

কৃপা। ভাল কথা, তুমি আসবার আগে আমি ছোট-বৌকে বলছিলাম—

ভোলা। (হঠাৎ চম্‌কে) কী বলছিলে ?

কৃপা। বলছিলাম—ভগবান যদি দিন দেন, তবে—

ভোলা। (রুক্ষ স্বরে) তবে ?

কৃপা। তবে ছোট-বৌএর মেয়ে রাধাকেই আমি নেব—আমার সমুর জন্যে।

ভোলা। সমুর বিয়ে দেব ঐ গেঁয়ো মেয়ে রাধার সঙ্গে—কখন না।

কৃপা। কী যে বল। তোমার ছেলেও কিছু সহুরে নয়।

ভোলা। নাইবা হ'ল, তবু ঐ রাধার সঙ্গে সমুর বিয়ে হবেনা। সমু আমার রাজপুত্তুর। কত দেশের কত রাজকন্যে তার পায়ে লুটিয়ে পড়বে।

কৃপা। আমার রাধারইবা রূপটা কম কী ? তোমার রাজপুত্তুরের পাশে রাজরাণী হবার যোগ্যতা সে রাখে।

ভোলা। হুঁম্! রাজরাণী!

নাকে চশমা টেনে দিয়ে অতি বিস্ময়ে সে কৃপাময়ীর দিকে চায়

আমার যে বৌ হবে সে সত্যিকারের রাজকন্যা।

কৃপা। সত্যিকারের রাজকন্যেই আমার সমুর পাশে দাঁড়াবে। আমার এ রাজকন্যার সোনা-দানার বালাই নেই, ওর মায়ের অন্তরের সম্পদই ওকে রাজরূপ দেবে।

ভোলা। কে? কার?

কৃপা। আমাদের ছোট-বৌ গো।

ভোলা। হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোট-বৌএর কী হ'য়েছে?

কৃপা। ছোট-বৌএর মত মেয়ে কটি হয়!

ভোলা। ছোট-বৌ আমার সমুকে ভালবাসে?

কৃপা। সমুর মঙ্গল-কামনাই যে তার পূজা। সে রাতদিনই ঠাকুরকে ডাকছে—

ভোলা। (ঔৎসুক্যে) কি, কী বলে ডাকছে?

কৃপা। ঠাকুর, আমার সমুকে হাকিম কর।

ভোলা। ছোট-বৌএরও এই কামনা?

কৃপা। শুধু কি নিজেই বলে। ঠাকুরের সামনে হাতজোড় করিয়ে মেয়েকেও শেখায়।

ভোলা। কি, কী শেখায়?

কৃপা। ঠাকুর, সমুদাকে হাকিম কর।

ভোলা। (আনন্দে) আমার রাধাও ডাকে?

কৃপা। ওর পুতুল-ঠাকুরের সাম্‌নে বসে ওর ভাঙ্গা ভাঙ্গা বুলিতে ডাকে,—ঠাকুর, সমুদাকে হাকিম কর!

ভোলা। ওগো, তাই বলে? আমার রাধাও তাই বলে! আমার সাতজন্মের মা! ওগো, আমার তিরিশ-বছরের দুখের কথা, ঐ পটের

ঠাকুরই তো শুনেছেন। সেই ঠাকুরই প্রসন্ন হ'য়ে ইঙ্গিত করলেন। নইলে, সমুর হাকিম হবার কথা পাঁচজনকে বলবার জোর পাই কোথা!

তিনি যেয়ে তাক থেকে বেহালা নামিয়ে এনে বাক্সের উপর রাখেন। সহসা গিন্নীর দিকে চেয়ে

ভোলা। গিন্নী, ছোট-বৌ কৈ?

রূপা। ঐ যে ঘরে।

ভোলা। ও! ছোট-বৌ!

ছোট-বৌ দরজায় এসে দাঁড়ায়

এই যে ছোট-বৌ। তুমি সাক্ষী গিন্নী, আমার সমুর জন্যে তোমার রাধাকে নিলাম ছোট-বৌ। এই আমার শেষ কথা—রাধা আমার সমুর জন্যেই রইল।

হঠাৎ পকেট থেকে ঘড়ি টেনে দেখে উদ্বিগ্ন ভাবে

গাড়ীর সময় হ'য়ে গেছে। খাবার সময় আর হবেনা গিন্নী। আমি চল্লাম।

দাওয়া থেকে বাক্স প্রভৃতি তুলে নিয়ে, দড়ি থেকে চাদরখানা টেনে বগলে চেপে তিনি ব্যস্ত ভাবে অগ্রসর হন। হঠাৎ কি ভেবে ফিরে এসে দাওয়ায় বেহালা রেখে

ও! হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই বেহালাটা আমার রাধামাকে দিও। এ আমি তাকেই দিলাম। সে বাজাবে আর ঠাকুরকে ডাকবে—ঠাকুর, সমুদাকে হাকিম কর। সমুদাকে হাকিম কর। সমুদাকে হাকিম কর।

তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তিনি অধিকতর ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে যান

দৃশ্য—ইস্কুল হলের ইঙ্গিত-গর্ভ দৃশ্য

ইস্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠে, ছেলেদের নেপথ্য কোলাহল স্তব্ধ হয়। হেডমাষ্টার মহাশয় চিন্তাক্লিষ্ট বিষণ্ন মুখে এসে হলের মধ্যভাগে দাঁড়ান

হেডমাষ্টার। আজ তোমাদের পাঠ দেবার মত মনের অবস্থা আমার নয়। তোমরা বোধ হয় জান, ভোলা মাষ্টার মশায় সমরকে কলেজে ভর্তি করবার উদ্দেশ্যে কলকাতায় গেছেন। তিনদিনের মেয়াদে তিনি বেরিয়েছিলেন, আজ সাতদিন অতীতপ্রায় তবু তিনি ফিরলেন না। তাতেই বিচলিত হবার কোন কারণ ছিলনা, কেননা মানুষ সব সময় মেয়াদের নির্দিষ্ট সময়ে কর্তব্য শেষ করে উঠতে পারে না। কিন্তু তাঁর ওপর ইস্কুল ফণ্ডের আট হাজার টাকা আনবার বরাদ্দ। কলকাতার কুটীল পথে গ্রাম্য সরল ইস্কুল মাষ্টার! চিঠিপত্তর আসেনি, কোন সংবাদও তাঁর পাওয়া যাচ্ছেনা। অমঙ্গল আশঙ্কাই স্বতঃ মনে উদয় হয়। তাই, আজ আমার মন অত্যন্ত বিচলিত। আমি আশা করি, আমি চলে গেলে তোমরা স্থির চিত্তে তোমাদের চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভোলা মাষ্টারের নিরাপত্তা কামনা করবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গ্রাম্য পোষ্টাফিসের প্রাঙ্গণ। পোষ্টাফিসের মেটে দাওয়ায় পাতা একখানি ছোট্ট বেঞ্চিতে বিষণ্ণ মুখে সমর উপবিষ্ট। পায়ের তলায় ভূমিতে পোষ্ট পিওন কেলো বোষ্টম। সমরের বয়স এখন ১৪ কি ১৫। কেলোর বয়স ১৮ কি ১৯। প্রাঙ্গণের আশে পাশে আজ লোকের জনতা। প্রবেশ করেন ব্যস্তভাবে হেডমাষ্টার মশায়। তাঁকে দেখে সমর উঠে দাঁড়ায়, কেলো উঠে এসে প্রণাম করে

হেডমাষ্টার। বোস বাবা, বোস! খাওয়া দাওয়া হ'য়েছে?

সমর বিষণ্ণ মুখে সজল চোখে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়

জানি হয়নি। এমনি ক'রে উপোস ক'রে বসে থেকেও তো লাভ নেই বাবা। বাড়ীতে যেয়ে খেয়ে দেয়ে নেওয়াই উচিত।

কেলো। সেই কথাই তো এতক্ষণ সমুদাদাঠাকুরকে বলছিলাম। আমরা তো নাওয়া খাওয়া ত্যাগ ক'রে পোষ্টাফিস আর ইষ্টিশন ক'রেছি। খবর এলে কি তোমার কাছে পৌছতে এতটুকু দেরি হবে দাদাঠাকুর! আমার মাষ্টারমশায়—

কেলো আর বল্‌তে পারে না। সে কেঁদে ফেলে। সমর চোখ মোছে

হেডমাষ্টার। আজ কী ঝড় যে ওর মনে বইছে বাবা, সেতো আমি বুঝি! তবু সান্ত্বনা দিতে হয়, তাই বলি। স্থির হ'তে আমি পারছি কই? ইস্কুলে পাঠ দিতে পারলাম না, উঠে এলাম। স্থির থাকতে পারলাম না, ছুটে এলাম খবর নিতে। আর কটায় ডাক বাবা?

কেলো। একটা বারোটায় আর একটা দু'টোয়।

হেডমাষ্টার। আচ্ছা, আমি এখন চলি। দেখি সর্বেশ্বরকে বলি। ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে যদি কিছু খাওয়াতে পারে।

তিনি ব্যস্ত ভাবে বেরিয়ে যান

কেলো। সত্যি দাদাঠাকুর, তুমি যাওনা, খেয়ে এস। বারোটার ডাকের ত এখন দেরি আছে।

প্রবেশ করে গ্রামবাসী বাঁড়ুজ্জে, নিবারণ ঘোষাল ও রাখাল চকোত্তি

বাঁড়ুজ্জে। ওরে কেলো, ভোলা মাষ্টারের খোঁজ খবর এল ?

নিবারণ। অতগুলো টাকা নিয়ে একেবারে নিখোঁজ, এতো ভাল কথা নয়।

রাখাল। গাঁয়ের ইস্কুল ফণ্ডের টাকা, সেতো সাধারণের টাকা বললেই হয়।

কেলো। হয়তো কোন কাজে আট্‌কে পড়েছেন। হয়তো কাজগতিকে আসতে পারছেন না, চিঠি লেখবারও সময় পাচ্ছেন না। কাজ তো কম নয়, সমুদাদাকে কলেজে ভর্তি করতে হবে। দাদাঠাকুর তো আর যে-সে পাশ করেনি !

বাঁড়ুজ্জে। কিরে কেলো, আজ কাল নাকি রাত বারোটা পর্যন্ত পোষ্টাফিস খোলা থাকে ?

কেলো। পোষ্টমাষ্টার মশায়ের চোখে ঘুম নেই। তিনি একাটি বসে থাকেন রাত এগারোটার ডাকের অপেক্ষায়।

বাঁড়ুজ্জে। কেন, নিয়ম কানুন সব উল্টে গেল নাকিরে ?

কেলো। মাষ্টারমশায়ের খবর নেব তার নিয়ম-কানুন কী ? ঐ পোষ্টাফিসের মাষ্টারবাবুও যার ছাত্র, এই কেলো বোষ্টমও তারই ছাত্র। আজ যা দুমুঠো খেতে পাচ্ছি, সেতো তাঁরই আশীর্বাদে। কদ্দিন ধরে আমাদের মাষ্টারমশায়ের চোখে ঘুম নেই।

বাঁড়ুজ্জে। জান ভায়া, সেবার মজিলপুরে আমার জামাইয়ের ওলাউঠা, খবরের জন্যে হত্যে দিয়ে পড়লাম পোষ্টাফিসে। ভাবলাম, মহারাণীর খবর-মন্দিরে হত্যে দিলে একটা খবর যা হ'ক পাবই। দেবী যদিচ প্রসন্না হ'লেন, পুরোত ঠাকুরের দয়া হ'লনা। বলেন—পাঁচটার পর খবর দেবার মায়ের নিষেধ আছে। এর জবাবদিহি করতে হবেনা—সহজে ছাড়ব ভেবেছিস ?

রাখাল। রেখে দেও তোমার জবাবদিহি। ইস্কুল ফণ্ডের টাকা সেতো

সাধারণের টাকা বললেই হয়। রাখাল কারু খায়না যে, ভয় করে কথা কবে। অতগুলো টাকা তোমরা জলে দিতে পার, আমি পারব না। রাখাল শর্মার হক্কের ধন নেই ওতে! অমনি নিখোঁজ হ'য়ে যাবে বললেই যাবে! ইস্কুল ফণ্ডের টাকা, সেতো সাধারণের টাকা বললেই হয়।

তৃতীয় দৃশ্য

সর্বেশ্বরের গৃহাঙ্গন। দাওয়ায় মাদুরে বসে সে তামাক খাচ্ছে

হেডমাষ্টার। (নেপথ্যে) সর্বেশ্বর আছ ?

সর্বেশ্বর চকিতে হুঁকা নামিয়ে নেমে আসে অঙ্গনে। হেডমাষ্টার প্রবেশ করেন

এই যে! আমি পোষ্টাফিস থেকে এলাম, এখনও কোন খবর আসেনি। বারটায় একটা ডাক আছে, আমি ঘুরে আসছি।

তিনি যেতে উদ্যত হ'য়ে ফিরে দাঁড়ান

হাঁ, সমরকে দেখলাম পোষ্টাফিসে বসে আছে। বোধকরি নাওয়া খাওয়া হয়নি—মুখখানা শুক্‌নো দেখলাম।

সর্বে। সমু তো কদ্দিন নাওয়া খাওয়া ছেড়ে পোষ্টাফিসেই বসে আছে। ও বাড়ীতে বড়-বৌও নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করে শয্যা নিয়েছেন।

হেডমাষ্টার। না না, ওদের খাওয়াতে হবে। তাহ'লে কি—

সর্বে। ছোট-বৌকে পাঠিয়েছি বড়-বৌকে ধরে আনতে। আমিও যাচ্ছি সমুকে ধরে আনি।

হেডমাষ্টার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই কর। আমি যাই একবার বাবুদের বাড়ী। জমিদারবাবুকে দিয়ে একখানা টেলিগ্রাম করিয়ে দি শিবনাথের কাছে।

সর্বে। তা এ রোদ্দুরে একটা ছাতা পর্যন্ত নেই—এ রকম ছুটোছুটি—

হেডমাষ্টার। এ-অশান্তি যে আমারই হ'য়েছে সবচেয়ে বেশী সর্বেশ্বর। আমিই কি শেষে নিমিত্তের ভাগী হব। আত্মভোলা, সরল লোক! যে আট

হাজার টাকাই কখন চোখে দেখেনি, তাকেই আনতে দিলাম কলকাতা থেকে টাকা। কলকাতার পথে চোর জোচ্চরের অভাব নেই। আচ্ছা, আমি ঘুরে আসছি।

তিনি ব্যস্তভাবে বেরিয়ে যান। খিড়কির দোরে প্রবেশ করেন ছোট-বৌ। সর্বেশ্বর এগিয়ে যায় ছোট-বৌএর দিকে সাতঙ্কে

সর্বে। ও বাড়ীতে কি কোন খবর এসেছে?

ছোট-বৌ। সমু এখনও ফেরেনি।

সর্বে। কোন খবর পেলে কি সমু আমার এতক্ষণ পোষ্টাফিসে বসে থাকে।

ছোট-বৌ। তুমি একবার যাও।

সর্বে। কোথায়?

ছোট-বৌ। দিদিকে তো আমি কিছুতেই আনতে পারলাম না। কোন কথাই সে বুঝতে চায় না।

সর্বে। বোঝাই বা কোন মুখ নিয়ে। যে-লোক গেল দুদিনের মেয়াদে, সাতদিন হতে চলল, তার ফেরবার মেয়াদ এল না।

ছোট-বৌ। তবু তুমি যাও।

সর্বে। সে তো যেতেই হবে। হ্যাঁ, হেডমাষ্টার মশায় এসেছিলেন। তিনি পোষ্টাফিসে সমুকে দেখে এলেন। বললেন—মুখখানা তার শুকিয়ে গেছে। এতখানি বেলা হ'ল, নাওয়া খাওয়া নেই।

ছোট-বৌ। তবে তুমি যাও, সমুকেই ধরে আন। আমি যাই একটু দিদির কাছে বসিগে। সমু এলে আমাকে খবর পাঠিও।

ছোট-বৌ পুনরায় খিড়কির দোরে বেরিয়ে যায়। সর্বেশ্বর দাওয়ায় যেয়ে দড়ি থেকে চাদরখানা টেনে নিয়ে কাঁধে ফেলে, জুতো জোড়া পায় দিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়ায়

রাখাল। (নেপথ্যে) সর্বেশ্বর ভায়া আছ ?

সর্বেশ্বর সদরের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে

সর্বে। রাখাল ভায়া নাকি ? এস, এস।

প্রবেশ করে রাখাল, বাঁড়ুজ্জে ও নিবারণ

নিবারণ। ভোলা মাষ্টারের খোঁজ খবর হ'ল ?

বাঁড়ুজ্জে। জল-জ্যান্ত মানুষটা একেবারে নিখোঁজ ! অতগুলো টাকা—

রাখাল। ইস্কুল ফণ্ডের টাকা, সে তো সাধারণের টাকা বললেই হয়।

সর্বে। সমু তো নাওয়া খাওয়া ছেড়ে পোষ্টাফিসেই বসে আছে। আমার বাড়ীতে তো রাধার মা নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করেছে। রাধার মুখে তো জ্যাঠা কখন আসবে লেগেই আছে।

বাঁড়ুজ্জে। সে তো হবেই, সে তো হবেই ; ছোট-বৌএর আবার শুনছি বড়-বৌ অন্ত প্রাণ। ভোলা মাষ্টার নাকি যাবার সময় লোভ দেখিয়ে গেছে, সমু হাকিম হ'লে রাধার সঙ্গেই বিয়ে দেবে।

এ কথায় রাখাল প্রভৃতি উচ্চহাস্য করে

সর্বে। সব ভাগ্যের কথা—সবই ভাগ্যের কথা।

রাখাল। অমন বলে সবাই, করে কজন ? জানিনে কী !

বাঁড়ুজ্জে ও নিবারণ। সে তো বটেই, সে তো বটেই।

রাখাল। (উৎসাহের সঙ্গে) এই নিবারণ ভায়ার কথাই ধর না। তার ছেলে কিছু জজ ব্যারিষ্টার নয়। পোষ্টাফিসের ডাকবাবু। তার ডাক হাঁকই বা কত ! ঐ নিবারণ ভায়া, আমার সামনে হারু চক্কোত্তিকে কথা দেয়নি ? তার মেয়ে মিণ্টুর সঙ্গেই ওর ছেলের বিয়ে দেবে !

নিবারণ। বলেছিলাম !

রাখাল। বলনি ?

বাঁড়ুজ্জে (মহা খুশিতে) তারপর তারপর ?

রাখাল। তখন মিণ্টুর বয়স হবে বছর আষ্টেক। ওর ছেলে সিধু বার দুই ফেল করে এণ্টেস্ পাশ দিলে। নিবারণ ভায়ার শালা, কলকাতার পোষ্টাফিসের অফিসার। সেই তো বলে ক'য়ে ঢুকিয়ে দিলে সিধুকে একটা গাঁয়ের পোষ্টাফিসে। টাকা বিশেক মাহিনা সাব্যস্ত হ'ল। হারু চক্কোত্তি সেই বছরেই ওলাউঠায় প্রাণ দিলে। মিণ্টুর মা এসে নিবারণ ভায়ার পায়ে কেঁদে পড়ল—মেয়েটার একটা ব্যবস্থা কর। নিবারণ ভায়া ব্যবস্থা তো করলেই না, উল্টে বললে—তোমার মেয়ের যোগ্যতা কী যে, আমার কৃতবিদ্য ছেলের ঘরনী হয়।

সকলে হেসে উঠে, নিবারণ হয় ক্ষুব্ধ

নিবারণ। কলকাতায় সাতপুরুষের বাস সাধন মুখুজ্জের। খান আষ্টেক বাড়ী আর সেই পরিমাপে ব্যাঙ্কে জমানো টাকা। তার পূর্বপুরুষ ছিল ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর খাজাঞ্চি। নাম ডাকই কি কম? আমার শালা হয় তার সম্পর্কে মাসতুতো ভাই। সম্বন্ধ করে বললে—রাজকন্যে অর্ধেক রাজত্ব নিয়ে শ্বশুর-ঘর করতে আসতে চায়। এমন দাঁও কোন বাপে ছাড়ে?

রাখাল। রাজকন্যে এল ঘরে, সে-খবর রাখি। কিন্তু তার অর্ধেক রাজত্বের নিশানা করতে গেলে দেখি, সে মারোয়াড়ীর ভাণ্ডারে লোহার দরজায় বন্দী। হা হা হা!

সকলে হেসে উঠে। বেগে প্রবেশ করে কেলো বোষ্টম ও গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তি। কেলোকে দেখেই চকিতে লাফিয়ে এগিয়ে যায় রাখাল চক্কোত্তি

কেলো। বাবাঠাকুর! সমুদাদাঠাকুরের নামে চিঠি। চিঠিতে কলকাতার ছাপ। সমুদাদাঠাকুর কই? তিনি যে একটু আগে বেরিয়ে এলেন।

সর্বে। বোধকরি ও বাড়ীতে এসেছে।

সর্বেশ্বর একটি ছেলেকে বলেন, সে বেরিয়ে যায়

যাও বাবা, একবার দেখ্ তো ও বাড়ীতে সমু এসেছে কিনা!

রাখাল। এ্যাঁ! ভোলা মাষ্টার তা হ'লে বেঁচে আছে? ইস্কুল ফণ্ডের টাকা, হক্কের টাকা বলতেই হবে।

রাখাল, বাঁড়ুজ্জে ও নিবারণ কেলোর হাত থেকে চিঠি ছিনিয়ে নেবার প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। প্রবেশ করেন বেগে হেডমাষ্টার

হেডমাষ্টার। এত সোরগোল, কোন খবর এল সর্বেশ্বর?

রাখাল কেলোর হাত থেকে চিঠি কেড়ে নেবার প্রচেষ্টা পায়

রাখাল। দে, দেনারে কেলো!

কেলো। (ধমক দিয়ে) রাখো ঠাকুর!

কেলো এগিয়ে যেয়ে হেডমাষ্টারের হাতে চিঠি দেয়। হেডমাষ্টার চোখে চশমা এঁটে দিয়ে খামখানা চোখের সামনে তুলে ধরেন। সমু ব্যস্তভাবে ছেলেটির সঙ্গে প্রবেশ করে

নিবারণ। একবার পড়ুন মাষ্টারমশায়, ভোলাদাদার খবরটা শুনে যাই।

রাখাল। সে তো শুনতেই হবে। হাজার হলেও ভোলানাথ তো আমাদের আপনার জনই।

বাঁড়ুজ্জে। তার ওপর অতগুলো টাকা তার জিম্মায়—

রাখাল। ইস্কুল ফণ্ডের টাকা সে তো সাধারণের টাকা বললেই হয়।

হেডমাষ্টার খাম ছিঁড়ে পড়তে থাকেন। সর্বেশ্বর যেয়ে সমুকে বুকে জড়িয়ে ধরে

হেডমাষ্টার। এ-চিঠি মাষ্টারমশায়ের নিজের হাতে লেখা। আজ সোমবার, গেল সোমবারের তারিখে লেখা।

সমর প্রবেশ করে

"পরম কল্যাণবরেষু—

খুশির সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এখানে তোমার থাকবার ও পড়বার সব ব্যবস্থাই সুসম্পন্ন হ'য়েছে। যতীশ নিচের তলার একখানি ঘর ছেড়ে দিয়েছে।"

রাখাল প্রভৃতি মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে

"প্রেসিডেন্সি কলেজেই তোমাকে ভর্তি করবার ব্যবস্থা করলাম। যতীশ বলে, আপনিও মাষ্টারি ছেড়ে এখানে আস্থন। আমি তাতে মত দিতে পারিনি! ইস্কুল ছেড়ে যে আমি থাকতে পারিনে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, ঐ ইস্কুলেরই আঙ্গিনায় যেন আমার মৃত্যু হয়। তবে কথা দিয়েছি। তোমার মাতাঠাকুরাণীকে মাঝে মাঝে পাঠাব।"

"সে যা হ'ক্, সেদিন পথে আমার আর একটি ছাত্রের সঙ্গে দেখা। সে এখন লক্ষ্মীমন্ত, দশের একজন। তোমার কথা শুনে বলে,—আমি কী অপরাধ করলাম মাষ্টারমশায়। তোমাকে হাকিম করবার আমার বাসনা শুনে, সে বলে, তোমার বিলেত যাওয়া আসা ও আই, সি, এস্ পরীক্ষা বাবদ সমস্ত খরচা সে বহন করবে। তোমার বি, এ পাশের পরই সে ঐ টাকা যতীশের ঠিকানায় পাঠাবে। তার নাম জানাতে পারলেই পরম সন্তোষ লাভ করতাম। কিন্তু তার সনির্বন্ধ অনুরোধে জানাতে অক্ষম হ'লাম। এ তার বিরূপ সখ।"

বাঁড়ুজ্জে। কপাল বলতে হয় একেই ভায়া, কপাল বলতে হয় একেই।

হেড মাষ্টার। "যতীশের সাহায্য ও মাসিক বিশটাকা জলপানিতে তোমার বেশ চলে যাবে। চাই কি মাসে মাসে গোটা পাঁচেক টাকা তোমার ছোট খুড়ী রাধার মাকে পাঠাতে পারবে। তাঁদের এতে অনেকখানি সাহায্য হবে। ওঁদের সঙ্গে যদিও আমাদের রক্তের সম্পর্ক নেই, কিন্তু ওঁরা আমাদের পরমাত্মীয়, একথাটি মনে রেখ।"

তুমি যাও বাবা, চিঠিখানা—এখুনি তোমার মাকে দিয়ে এস।

চতুর্থ দৃশ্য

ভোলানাথের গৃহাঙ্গন। দাওয়ায় মাটিতে বসে আছে কৃপাময়ী। পার্শ্বে বসে আছে ছোট-বৌ। ছোট-বৌ হাওয়া করছে

কৃপা। আমার কী সর্বনাশ হ'ল বোন? কী কাল পাশই করলে সমু—

ছোট-বৌ। ওকথা বলে নিজের ছেলের অকল্যাণ কোরো না দিদি। ভগবানের নিশ্চয়ই কোন শুভেচ্ছা আছে। আর বড়ঠাকুরের কথা যদি বল, তিনি কাজের লোক কাজে মেতেছেন। ইস্কুলের পাকা গাঁথুনি হবে, এ আনন্দ যে তাঁরই সব চেয়ে বেশী।

কৃপা। আমি যে কোন মতেই মনকে বোঝাতে পারছি না ভাই। সাত দিন হতে চলল—

সমর পূর্বদৃষ্ট চিঠিখানি হাতে করে প্রবেশ করে। চিঠিখানি মায়ের সম্মুখে ফেলে দিয়ে বলে

সমর। বাবার চিঠি—

কৃপা সাগ্রহে উঠে বসে

কৃপা। ওঁর চিঠি?

তিনি চিঠি খুলে সাগ্রহে পড়তে থাকেন

সমর। আমি যাই বাবুদের বাড়ীতে খবর দিয়ে আসি!

সে বেরিয়ে যায়

ছোট-বৌ। কী লিখেছেন?

কৃপা। সমরকে ভর্তি করেছেন কলেজে, আর যতীশের বাড়ীতে তার থাকবার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু—

ছোট-বৌ। এইবার ওঠ দিদি। ওবাড়ীতে গিয়ে মুখে দুটো কিছু দিয়ে নেবে। আর তো ভয়ের কোন কারণ নেই।

রুপা। সোমবারের চিঠি এল সাত দিন পরে। সাত দিনের আর কোন খবর নেই। অতগুলো টাকা সঙ্গে, কলকাতার পথ, নিশ্চিন্তই বা হই কী করে বল্ ছোট-বৌ। যে-মানুষ গেল তিন দিনের মেয়াদে, সাত দিন হতে চলল—

ছোট-বৌ। কী যে বল দিদি! কাজই কি কম? শুন্‌লাম, হেড-মাষ্টার মশায় যাবার সময় ইস্কুল বাড়ীর সমস্ত জিনিষ কেনবার ফর্দ দিয়েছেন। হয়তো সেই সব নিয়ে ব্যস্ত আছেন। একে তো ভুলো লোক, তার ওপর কাজের চাপ, চিঠি লেখবার ফুরসতও নেই, মনও নেই। কাজের লোক কাজে মেতেছেন।

রুপা। যতীশকে লেখা হ'ল, বাবুদের বাড়ীর শিবনাথকে লেখা হ'ল— তদেরও তো কোন খবর নেই।

ছোট-বৌ। অমঙ্গল ডেকে আনতে নেই দিদি। চল, দুমুঠো খেয়ে নেবে।

বৌ-গিন্নী ও সিন্ধুর-মা প্রবেশ করেন

বৌ-গিন্নী। আমাদের সরকারের ভাইটা ছুটে গিযে বললে, মাষ্টারের নাকি চিঠি এসেছে। তা বেশ হ'য়েছে।

ছোট-বৌ। সাত দিনের আগের লেখা চিঠি—

বৌ-গিন্নী। তা হ'ক। তবু তো তার হাতের লেখা! লিখেছে তো!

ছোট বৌ। তাই তো দিদিকে বোঝাচ্ছিলাম। হয়তো কাজের লোক কাজে আট্‌কে পড়েছেন। কাজ তো কম নয়। ইস্কুল বাড়ীর মালমশ্‌লা তাঁকেই তো অর্ডার দিতে হবে। তা দিদি কিছুতে বুঝছে না।

বৌ-গিন্নী। তা অমন হয় লো হয়। আমার ছেলে ঐ শিবনাথ, সেবার ছুটির পর কলকাতায় গেল। তিন মাসের মধ্যে একখানা চিঠি লিখলে না। আমি তো ভেবে সারা। ওঁকে ভয়ে ভয়ে বলি, ছেলেটার একটা খবর নেও। তিনি তো রেগেই আগুন! বলেন,—যে-ছেলে তার

বাপ মায়ের খবর নেয় না, তার খোঁজে আমার দরকার কী! অমন ছেলে বাঁচল কি মরল, সে খোঁজে আমার দরকার নেই। মন বোঝে না চুপি চুপি অম্‌রাকে বলি,—একটা খবর নে। অম্‌রা বলে,—আজ-কালকার ঐ ফেশেন হ'য়েছে মা। আমি বলি,—ফেশেন-মেশেন রেখে দে বাবা, একবার লোক পাঠিয়ে খবর নে। ঘরের লোক বাড়ীতে না ফিরলে মন উড়ু উড়ু করে বৈ কি! তা কী করবি বল্! ভেবে চিন্তে তো লাভ নেই। একটু আগে হেডমাষ্টার গিয়েছিল, উনি সরকারকে পাঠালেন মাষ্টারের খোঁজে। তা বৌ খেয়েছিস ?

ছোট-বৌ। দিদিকে তো কোন মতেই খাওয়াতে পারছি না।

বৌ-গিন্নী। সে কি লা বৌ, তুই কি ক্ষেপ্‌লি ? না খেয়ে দেয়ে সত্যিই কি একটা অমঙ্গল ঘটাতে চাস্ ?

সিন্ধুর-মা। চল্ বৌ, যা হ'ক তুটো মুখে দিয়ে নিবি। সধবা মনিষ্যি কি উপোস্ ক'রে থাকতে আছে ? পাল না পার্বন, না, শুধু শুধু উপোস ! যা হ'ক কিছু মুখে দিয়ে নিয়ে আমার বাড়ী চল্। ঝুলনে এবারে কলকাতা থেকে সেরা কীর্তনওয়ালী এসেছে। তু দণ্ড বসে তার গান শুন্‌লেও মনটা হাল্কা হবে।

ছোট-বৌ। কোন লোভেই দিদিকে এখান থেকে ওঠাতে পারিনি। বলে, দেখ আমার ঘরেই বুঝি হয় ঝোলার পত্তন, ঝুলন দেখব কোন্ সুখে ? ঠাকুরকে ডেকে বুঝি ঝুলিই হ'ল সার।

কৃপাময়ী কেঁদে ওঠেন

কৃপা। আমার কী হবে দিদি ?

বৌ-গিন্নী। নে বৌ, চুপ কর দিকি। আমার চোখেও লঙ্কার-ছিটে দিলি।

তিনি আঁচলে চোখ মোছেন

ঘরের লোক ঘরে না ফিরলে, তাই তো মনে হয় সিন্ধুর-মা। ঐ লোকের মাথাতেই সব—এখন কি আর ঝুলন মাতনে মন চায়। হ্যাঁরে ছোট-বৌ, সম্‌রা কৈ?

ছোট-বৌ। সেও তো অন্নজল ত্যাগ করেছে। এইমাত্র এসেছিল, তোমাদের বাড়ীতেই গেছে খবর দিতে। বোধকরি এতক্ষণ ওবাড়ীতে ফিরেছে।

বৌ-গিন্নী। নে বৌ ওঠ্, যা পারিস দুমুঠো খেয়ে নিবি চল্।

কৃপা। না দিদি, আমার খেতে ইচ্ছে নেই। তুমি যাও সমুকে ধরে খাইয়ে দেও।

বৌ-গিন্নী। সে হয় না বৌ। আমি যখন এসে পড়েছি, তখন না-খেয়ে যে মাষ্টারের এত বড় অকল্যাণ করবি, তা কখনই হ'তে দেব না।

তিনি যেয়ে কৃপাময়ীর হাত ধরে তোলেন। সর্বেশ্বর প্রবেশ করে গলার শব্দ করে। বৌ-গিন্নী ফিরে চান

এস সর্বেশ্বর।

সর্বেশ্বর। আমি এলাম একবার বৌদিকে বলতে—

বৌ-গিন্নী। সেই চেষ্টাই তো দেখছি। সম্‌রা কি ওবাড়ীতে এসেছে?

সর্বেশ্বর। এসেছে—ধরেও রেখেছি। পথে রাখাল, নিবারণরা কী বলেছে, তাইতে তো সে কেঁদে কেটে অস্থির। তাকে বোঝাতে তো আমি কিছুতেই পারি না। তারা নাকি বলেছে, দাদা ঐ আট হাজার টাকার জন্যেই নিখোঁজ হ'য়েছেন।

বৌ-গিন্নী। এ তাদের যোগ্য কথাই বলেছে সর্বেশ্বর। ওরা যে খেঁকীকুকুরের দল, তাড়ালে যায় না, লাঠি দেখালেও নড়ে না। আয় বৌ!

তিনি একরূপ কৃপাময়ীকে টেনে নিয়েই বেরিয়ে যান। অন্যান্য সকলে তাঁর অনুগমন করে। সর্বেশ্বর এদিকে ওদিকে চেয়ে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই প্রবেশ করে কেলো বোষ্টম

কেলো। (উত্তেজিত কণ্ঠে) সমু দাদাঠাকুর! সমু দাদাঠাকুর!

সর্বেশ্বর কিছু বলবার পূর্বেই প্রবেশ করে জনতা,—রাখাল, বাঁড়ুজ্জে ও নিবারণের অধিনায়কত্বে

বাঁড়ুজ্জে। আর কিছু খবর এল নাকি রে কেলো?

কেলো। সমু দাদাঠাকুরের নামে গভরমেণ্টের চিঠি।

রাখাল। (হাত বাড়ায়) কৈ কৈ—দে।

কেলো। পোষ্টমাষ্টারবাবু আনছেন।

রাখাল। কেন, আজকাল কি ডাক-পিওন উঠেছে পোষ্টমাষ্টারের পদে, আর পোষ্টবাবু নেমেছেন ডাক-পিওনের কাজে?

কেলো। তিনি বললেন—তুই যারে কোলো, খবরটা দে।

নিবারণ। বুঝলে না ভায়া, গভরমেণ্টের চিঠি কিনা।

রাখাল। সরকারী চিঠি!

কেলো। খাগি রঙের খাম—গভরমেণ্টের শীল আঁটা!

রাখাল। কেমন, কথা ফলল! নিখোঁজ লোকের খোঁজ এবার হ'লতো! অতগুলো টাকা যার জিম্মেয়, সে অমনি কোম্পানীর রাজ্যে নিখোঁজ হ'য়ে যাবে বললেই যাবে! তার পাক্-পেয়াদা কত! ইস্কুল ফণ্ডের টাকা সেতো সাধারণের টাকা বল্লেই হয়।

কেলো। আজ চারটের ডাক এল। মাষ্টারমশায় ডাকলেন—কেলো! বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠল। মাষ্টারমশায় বলেন—সমুর নামে যে আর একখানা চিঠি। ওরে কেলো, এযে দেখি সরকারী শীল আঁটা! তুই

ছুটে যারে কেলো, খবরটা দে। আমি ছাপ দিযেই নিয়ে যাচ্ছি। তিনি ছাপ লাগাতে লাগলেন, আমি একদৌড়ে ছুটে এলাম।

নেপথ্যে পোষ্টমাষ্টারবাবু ডাকতে ডাকতে আসেন

পোষ্টমাষ্টার। সমু আছ—সমু!

পোষ্টমাষ্টারবাবু প্রবেশ করেন, হাতে তাঁর খাগি রঙের খাম। সকলে তাঁকে ঘিরে দাঁড়ায়

রাখাল। সরকারী চিঠিইত বটে!

গুঞ্জন ওঠে। সকলের মুখেই "সরকারী চিঠি", সেইক্ষণে সকলকে ঠেলে বেগে প্রবেশ করেন হেডমাষ্টার। তিনি পোষ্টমাষ্টারের হাত থেকে চিঠি নিয়ে উ'চু ক'রে ধরেন সকলের নাগালের বাহিরে

বাঁড়ুজ্জে। সরকারী চিঠি!

রাখাল। সরকারী চিঠি!

নিবারণ। সরকারী চিঠি!

অন্ত্যরঙ্গ

দৃশ্য—ইস্কুল হলের ইঙ্গিত-গর্ভ দৃশ্য

ছেলেদের কোলাহল স্তব্ধ হয়। হেডমাষ্টার মশায় ধীরে ধীরে এসে হলের মধ্যভাগে দাঁড়ান। হাতে তার মুখখোলা সরকারী খাম

হেডমাষ্টার। বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে, এই ইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা তোমাদের চির পরিচিত ভোলা মাষ্টার আর ইহলোকে নেই। এইমাত্র কলকাতার পুলিশ কমিশনারের—তাঁর মৃত্যু-সংবাদবাহী যে-পত্র পেয়েছি, তার মর্ম আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি। কলকাতার পুলিশ কমিশনার পত্রে লিখছেন—

···গত রাত্রে পোর্ট পুলিশ গঙ্গাগর্ভ থেকে একটি শবদেহ উদ্ধার করে। বিজ্ঞাপন ক্রমে আপনার গ্রামের জমিদার পুত্র শিবনাথ ও ঐ গ্রামের এবং কলিকাতার প্রসিদ্ধ এড্‌ভোকেট মিঃ জে, সি, ঘোষের সনাক্তে প্রকাশ যে, উহাই আপনার পিতার শবদেহ। হাওড়া ষ্টেশনের নিকটবর্তি গঙ্গার তীরে

একটি গাছের নিচে আপনার পিতার একটি টিনের বাক্স ও তাঁহার পরিত্যক্ত একটি ছিন্ন পিরাণ পাওয়া যায়। উহারই ভিতর পকেটে পাওয়া যায় আপনার পিতার স্বহস্ত লিখিত ও স্বাক্ষরিত একখানি হিসাবের কাগজ ও তিনখানি হাজার টাকার নোট। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের রিপোর্টে প্রকাশ যে, বক্রী পাঁচ হাজার টাকা খুচরা নোটে ছিল। সে বাণ্ডিল বড় থাকায় সন্দেহ করা যায়, তাহা বাক্সে ছিল। পুলিশ সন্দেহ করে, কোন বা ততোধিক গুণ্ডা কর্তৃক তিনি নিহত হয়েছেন। গুণ্ডারা তাঁর বাক্সের মাত্র পাঁচহাজার টাকা নিয়েই ক্ষান্ত হ'য়েছে। পিরাণের ভিতর পকেটের তিন হাজার টাকা ও খুচ্‌রা কয়েকটি মুদ্রা তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে নি। পুলিশ তদন্ত চলছে।

অভাবিত এই শোচনীয় মৃত্যু। যে-ঝড়ে আজ আরব্ধ কার্য বিক্ষিপ্ত হ'য়ে গেল, কে জানে তার শেষ কোথায়। এতবড় ক্ষতির আঘাত সহ্য করে এই ইস্কুলের চালাঘর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে কিনা, জানিনা। সেই অনাগত দুর্যোগকে স্মরণ করে আমার মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠছে। আজ আমার কিছু বলবার দিন নয়, শোকের দিন। তোমরা পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাও, তিনি যেন তাঁর আত্মার সদ্গতি করেন।

যবনিকা

দৃশ্য—ইস্কুল হলের ইঙ্গিত-গর্ভ দৃশ্য

ইস্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠে। নেপথ্যে ছেলেদের কোলাহল স্তব্ধ হয়। হেডমাষ্টার মহাশয় শান্ত, সৌম্য মূর্তীতে এসে হলের মধ্যভাগে দাঁড়ান

হেডমাষ্টার। বস বস। আমাদের ইস্কুলের পঞ্চচত্বারিংশত্তম বাৎসরিক আগতপ্রায়। সেই উৎসবের দিনে আমাদের মহোৎসব হবে এই ইস্কুলের নূতন গৃহের উদ্বোধন। কতনা কোলাহল, কতনা আনন্দ, কতনা উদ্দীপনা! তোমাদের গ্রামের ইস্কুলের ইমারত সম্পূর্ণ প্রায়। যে মহাপুরুষের নামে এই ইস্কুলের নামকরণ হবে, তাঁর নাম তোমরা সকলেই

জান। তিনি আমাদের এই গ্রামের চিরপরিচিত ভোলা মাষ্টার। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে একখানি পোড়ো খোড়ো চালার ঘরে তিনি একটি পাঠশালা বসিয়েছিলেন। সেই পাঠশালার খোড়োচাল প্রসার লাভ করলে বছরের পর বছর তাঁরই অদম্য উৎসাহে। একটি আগাছার চাড়া মালীর যত্ন উৎসাহে মহীরুহে পরিণত হ'ল। কতনা তার শাখা প্রশাখা, কতনা পল্লব, কতনা ফুল ফলের প্রাচুর্য! তোমরা হয়তো জান না, সেদিনও হয়তো তোমরা গর্ভবাসে। তোমাদের সেই আসন্ন জন্মলগ্নে এই ইস্কুলের ইমারতের সূচনা হয়েছিল। সে আজ তে'র চোদ্দ বছর আগের কথা। যে বিরাট মহীরুহ আজ শিখর গেড়ে বসেছে, সেদিন তার দেহে এ শক্তি সঞ্চিত হয়নি। দম্‌কা হাওয়ায় তার সর্বাঙ্গ তখনও দুলে ওঠে! এমনি দিনে এক বিরাট ঝড়ে তাকে নিঃসাড় করে দিলে। ভোলা মাষ্টারের হাতে ইস্কুলের সর্বস্ব। তিনি কলকাতায় গেলেন এই ইমারতেরই আয়োজন করতে। আততায়ীর হাতে ইস্কুলের সর্বস্ব হারিয়ে তিনি প্রাণ দিলেন। ইস্কুল হারালে তার সঞ্চিত ধন, আর হারালে তার মহাপ্রাণ হিতৈষী। সেদিনের কথা স্মরণ করতে ভয় পাই। ইস্কুল তার মহাপ্রাণ হিতৈষীকে হারালে বটে, কিন্তু তাঁর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। তাঁরই সাধনা, তাঁরই অসমাপ্ত কাজ আজ সম্পূর্ণ হ'ল তাঁর দেশ গৌরব সন্তানের মধ্য দিয়ে। তোমরা সকলেই হয়তো জান, তাঁর সন্তান সমরচন্দ্র আজ এই জেলারই হাকিম। তাঁরই দাক্ষিণ্যে ইস্কুল পাকা হ'ল। পিতার সম্পূর্ণ পুত্র সমরচন্দ্র, পিতৃঋণ শোধ ক'রে তার পিতাকে ঋণমুক্ত করলে। এ যে আমারই গৌরব—আমি তার শিক্ষক। আজ আমি বার্ধক্যের পীড়নে জড়, চোখের জ্যোতি ক্ষীণ। কিন্তু হে তরুণ! তোমাদেরই জ্যোতিঃপিপাসু বিকাশোন্মুখ তারুণ্যের স্পর্শে আমি তরুণ। এ আমার এক বিরাট তারুণ্যের তীর্থ-মেলা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমরা সমরচন্দ্রের আদর্শকে জীবনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে বহন ক'রে, অম্লান তেজে ধীরে ধীরে উদয়পথে আরোহণ কর।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

তের বৎসর পর

আই, সি, এস সমরেন্দ্রের বাংলোর একখানি সুদৃশ্য ড্রয়িংরুম। এখন তার বয়স ২৬।২৭। কোর্টফেরতা য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ পরনে প্রবেশ করে সমরেন্দ্র। সময় অপরাহ্ণ

সমর। মা! মা!

বেয়ারা কেষ্টচন্দর এসে তার পেছন থেকে কোট খুলে নিয়ে চলে যায়। একখানি সোফায় বসতে বসতে সে টাই খুলতে থাকে।

কৃপাময়ী প্রবেশ করেন। এখন তাঁর চেহারার বহু পরিবর্তন হ'য়েছে। বয়স যে তাঁর ষাট পেরিয়েছে। চুলের অধিকাংশই হ'য়ে গেছে সাদা—কাঁচাপাকার অপূর্ব সম্মিলন। মুখশ্রীরও সেই ভাব। পরনে শেমিজের উপর একখানি পরিচ্ছন্ন থান। চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা, হাতে তাঁর একখানি মহাভারত।

ওখানা মহাভারত বুঝি? মা! মহাভারতের কোনখানটায় আছ?

কৃপা। স্বর্গারোহণ পর্বে।

সমর হঠাৎ মায়ের নাক থেকে চশমা ছিনিয়ে নিয়ে নিজের নাকে বসিয়ে দেয়। দুইহাত পশ্চাতে নিবদ্ধ ক'রে একটু সামনে ঝুঁকে দাঁড়ায়। মায়ের সামনে দুবার পায়চারি করে

সমর। হুঁম্! স্বর্গারোহণ পর্ব। হুঁম্! মহাভারতের কথা উঠ্‌লেই মনে জাগে—উত্তর ভারতের মহাতীর্থগুলিরই কথা। তাহ'লে আজ সেই তীর্থগুলির সম্বন্ধেই আমাদের পাঠ আরম্ভ হ'ক। বলতো বলতো মা, হিমালয়ের বুকের উপর যে তীর্থগুলি আছে, তাদের নাম? জাননা! হুঁম্! হিন্দুর দুটি মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতকে কেন্দ্র ক'রে ভারতের বুকে যে মহাতীর্থগুলি গড়ে উঠেছে—ভারত সভ্যতার সাক্ষ্যরূপে তারা

শতাব্দীর পর শতাব্দী অসংখ্য জন-পদধূলি বক্ষে ধারণ ক'রে অমর হ'য়ে আছে। আজ মহাপ্রস্থানের পথে মাত্র যে-ক'টি তীর্থ-স্থান আছে, তাদেরই কথা বলব।

শুনতে শুনতে কৃপাময়ীর চোখে অশ্রুরধারা বইতে থাকে। আপন পুত্রের মধ্যে স্বামীর অবলুপ্ত অবয়ব সন্দর্শনে তিনি চম্‌কে উঠেন

কৃপা। খোকা! খোকা!

ছেলেরও জড়-চেতনা জাগরিত হয়, ছেলে কুণ্ঠিত হয়। চাপা দিতে চায় হাসি দিয়ে আর কথা দিয়ে। সে হেসে উঠে নাক থেকে চশমা খুলে মায়ের নাকে পরিয়ে দেয়

সমর। কিছু বলতে গেলেই বাবার প্রতিটি ভঙ্গী যেন আমার মধ্যে জীবন্ত হ'য়ে ওঠে। এ আমি কোন মতেই কাটাতে পারিনা! বাবার ভূগোল-বিবরণের প্রতিটি শব্দ আজও কানে লেগে আছে। মনে পড়ে বাবার ভূগোল-বিবরণের সরল গল্পগুলি। ভূগোল পড়ানোর তাঁর রীতিই ছিল আলাদা। গল্পের ভেতর দিয়ে ভূগোল-বিবরণের নীরস তথ্যগুলিকে এমন মর্মস্পর্শী ক'রে তুলতে পারতেন যে, কোন ছেলেই বোধকরি কোনদিন সে কথা ভুলতে পারবে না। পরীক্ষাতেই তার শেষ নয়, প্রতি ছাত্রের বুকে তা হ'য়ে আছে সঞ্চয়।

সে সোফায় যেয়ে বসে। বেয়ারা এসে জুতো খুলে—জুতো ও টাই নিয়ে চলে যায়

একটা কথা আমার মাঝে মাঝে মনে হয়।

কৃপা। কী বাবা?

সমর। বোধকরি আমার মাষ্টার হ'লেই ভাল হ'ত। বাবার মাষ্টারি-ভাব আমার ভেতরে সম্পূর্ণ হ'য়ে আছে। হ্যাঁ একটা কথা মা, এই মাসের শেষে পড়েছে বাবার ত্রয়োদশ বার্ষিক শ্রাদ্ধ। কোর্ট থেকে ফেরবার পথে পণ্ডিতমশায়ের বাড়ী গিয়েছিলাম। তাঁকেই সমস্ত ব্যবস্থা করবার ভার দিয়ে এলাম।

কৃপা। (স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে) ত্রয়োদশ বার্ষিক শ্রাদ্ধ! দেখতে দেখতে তের বৎসর অতীত হ'য়ে গেল। মনে হয়—সেদিন। আজও সে ছবি আমার চোখে লেগে আছে। কলকাতায় যাবার দিন আমি তাঁকে বল্লাম,—সমুকে ইস্কুলেরই একটা কাজে ঢুকিয়ে দেও। তিনি রেগে বললেন,—অমন ছেলে কজনের হয়। সে বড় হবার প্রেরণা নিয়ে জন্মেছে। সে হবে দেশের ও দশের গর্ব। সে গর্বকে খর্ব করি আমার সাধ্য কী! আমার ছেলে হাকিম হবে, হাকিম সে হবেই।

সমর ডেস্কের কোর্টফাইল থেকে একখানা টেলিগ্রাম এনে, মায়ের পায় প্রণত হয়

সমর। ভাল কথা মা—আজই টেলিগ্রাম পেয়েছি, আমাকে অতিরিক্ত সেশন জজের পদ থেকে হুগলীর স্থায়ী সেশন জজ নিযুক্ত করা হয়েছে।

কৃপা। আমাদের জেলার হাকিম হলি তুই!

তিনি নিমীলিত চোখে স্থিরভাবে বসে থাকেন। দু'চোখে তাঁর অশ্রুধারা।
তিনি আপন মনে বলতে থাকেন

হাকিম! হাকিম!. হাকিম!

তারপরে চোখ খুলে বলেন

তোর বাবার স্বপ্ন এতদিনে সফল হ'ল বাবা।

সমর। তাঁরই ইচ্ছা ছিল চির-সত্য হ'য়ে আমার মনে। সেই ইচ্ছাই দেবীরূপে আমাকে সকল সঙ্কটে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। আর এক শক্তি চির-জাগ্রত ছিল আমার শিয়রে। বলতো সে কে?

মিঃ চাটার্জি। মা।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ চাটার্জি সেইক্ষণে দরজায় এসে দাঁড়ান। বয়স তাঁর পঞ্চাশের কাছাকাছি। পরনে তাঁর টেনিস সুট, হাতে র‍্যাকেট। কৃপা ও সমর যুগপৎ ফিরে চায়। তারা উঠে দাঁড়ায়

পৃথিবীর মধ্যে শুদ্ধ এই ভারতই নারীকে শক্তি বলে পূজা করেছে। সেই দেবীই সন্তানকে সত্য ও জয়ের পথে চালনা করেছেন। নমস্কার!

কৃপাময়ী প্রতি নমস্কার করেন

কৃপা। আসুন।

মিঃ চাটার্জি। মাতৃবন্দনার আগেই আমি ঢুকেছিলাম, তাই সমরের হ'য়ে জগন্মাতার বন্দনা গেয়ে ধন্য হ'লাম।

সমর। আপনি মায়ের সঙ্গে বসে গল্প করুন মিঃ চাটার্জি, আমি পোষাক বদলেই আসছি। প্রস্থান

মিঃ চাটার্জি একখানি সোফাতে বসলে কৃপাময়ী আর একখানিতে বসেন

মিঃ চাটার্জি। আমার জীবনের কথা। সেকেলে সিভিলিয়ান। বিলেত থেকে ফিরে এলাম একটি বুনো শূয়ার। খাদ্যাখাদ্যের বিচার ভুলে মহা অনাচারী হ'য়ে উঠলাম। মাও পেলাম না, দীক্ষাও হ'ল না। ঘোর নাস্তিক্যের মধ্যেই পথ হ'ল সুরু। ধর্ম ভুললাম, শাস্ত্র ভুললাম, দেবী অর্চনা কুসংস্কার প্রচার করলাম। সেই অগৌরবকে বহন করে বেশ এত দিন চলছিল। হঠাৎ আমার জীবনে এল সমর, মাথায় মাতার আশীর্বাদের প্রদীপ শিখা। যে-সত্য ছিল অবলুপ্ত, সে হ'ল প্রদীপ্ত। সমস্ত গণ্ডগোল হ'য়ে গেল। তাইতো ছুটে এখানে আসি। আমার বদলির হুকুম এসেছে, বোধ করি শীঘ্রই আমাকে এখান থেকে যেতে হবে। সমর বলেনি আপনাকে?

কৃপা। হ্যাঁ।

মিঃ চাটার্জি। আমার কি দশা বুঝুন দিকি। গীতা উপনিষদ পড়তে আরম্ভ করেছিলাম সমরের অধ্যাপনায়। বাড়ীতে তো বই খোলবার জো নেই। চাকর বেয়ারা গুলোও হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে। তাইতো খেলবার ছুতো করে বই নিয়ে এখানে আসি। হ্যাঁ, সকালে আমার ছোট মেয়ে উল্কা এসে পৌছেচে। তাই এলাম, আমার পুরনো আবেদনটা নতুন ক'রে

পেশ করতে। সমরকে আপনার ক'রে রাখবারই লোভ মেয়েটার বিনিময়ে।

কৃপা। ঐ কথাই তো সমরকে রোজ বলছি। কবে মরে যাব, যাবার আগে বৌ দেখবার বাসনা। থাকতে থাকতে বৌকে শিখিয়ে পড়িয়ে যেতে চাই। এমন ছেলে, কারু হাতে খাবে না। আমি ম'লে, ওর বৌ না হ'লে একদণ্ড চলবেনা। সমর যে সে কথা কানেই তোলে না। বলে, পালিতে এম্, এ টা দিয়ে নি। তারপর শুনব তোমার কথা। দেখুন দিকি, ওর পড়া কি কখনো শেষ হবে না?

পোষাক বদলে আসে সমর। পরনে কোঁচানো ধুতি, গায়ে পাতলা পাঞ্জাবী। তারই ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে একগোছা পৈতে, পায়ে চটি।

সেইক্ষণে বাহির দরজায় প্রবেশ করে উল্কা ও তপেন। তপেন জেলার পুলিশ সাহেব। উল্কার পরনে শাড়ী, পায়ে টেনিস সু। তপেনের পরনে টেনিস সুট, হাতে র‍্যাকেট

তপেন। গুড্ ঈভিনিং মিঃ ভট্টাচার্য।

মিঃ চাটার্জি উঠে উল্কাকে ধরে কৃপাময়ীর সম্মুখে নিয়ে গিয়ে

মিঃ চাটার্জি। এই আমার ছোট মেয়ে উল্কা। ইনিই আমাদের ডিষ্ট্রিক্ট সেশন জজ মিঃ ভট্টাচার্যের মা।

উল্কা। (হাত তুলে) নমস্কার!

কৃপাময়ী মেয়েটির উদ্ধত ভঙ্গীতে স্তব্ধ হয়ে যান। কোনরূপে হাত তুলে প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন করেন। সমর এগিয়ে আসে

মিঃ চাটার্জি। সেশন জজ মিঃ ভট্টাচার্য। উল্কা,—আমার মেয়ে। গেলবার তোমার ভেকেশনের পর উনি এখানে বদ্‌লি হ'য়ে এসেছেন।

উল্কা সমরের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করবার জন্যে হাত বাড়ায়

উল্কা। গুড্ ঈভিনিং!

সমর নমস্কার জ্ঞাপন করতে কপালে হাত তোলে। উল্কা তপেনের দিকে এগিয়ে যেয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চায়। পরে সমরের পোষাকের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে চাপা গলায় বলে

হাউ আগ্‌লি !

মিঃ চাটার্জি একপাশে যেয়ে বসে গীতা খুলে পড়তে থাকেন। উল্কা মিঃ চাটার্জির পাশে যেয়ে

বাবা ! এবার এসে দেখছি তুমি একেবারে আদিম অসভ্যতার যুগে ফিরে যেতে বসেছ ! ইউ আর রিডিং হিব্রু স্ক্রিপ্ট্ !

মিঃ চাটার্জি। রাদার এন্ এন্‌শেণ্ট্ স্ক্রিপ্ট্। যে-ভাষায় আমাদের পূর্বপুরুষ ভারতে আর্য সভ্যতা প্রচার করেছিলেন,—সে হিব্রু নয় মা—সংস্কৃত। তুমি বোধ হয় জাননা, তরুণ সিভিলিয়ান সমর সে ভাষায় একজন অথোরিটি। সে শুধু সিভিলিযানই নয়,—সংস্কৃত, ফিলজপি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে এম্, এ।

উল্কা। ইজ্ ইট্ ? যাই বলুন মিঃ ভট্টাচার্য, এতখানি বর্তমান বর্জন আপনার বাড়াবাড়ি। জগতের এই বিবর্তনের দিনে, অতীতকেই আঁকড়ে পড়ে থাকা—আই মিন, আই মিন—

তপেন। মঙ্গলেরও নয়, গৌরবেরও নয়।

উল্কা। রাইট ! থ্যাঙ্ক ইউ !—আর এতে দেশেরও মঙ্গল। সেই বিবর্তনের ছন্দে গতি মিলিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক।

সমর। দেশকে বড় দেখতে পাওয়া সৌভাগ্যের সন্দেহ নেই উল্কা দেবী। কিন্তু দেশ যার জন্যে বড়, তাকেই ঝেঁটিয়ে বিদায় করায়, মহত্ত্বও নেই, মঙ্গলও নেই। আমার দেশের মধ্যে, ধুলোর মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে, যে-অনুভূতি মানুষের পড়ে আছে, তাকে এতদিন যে বাঁচিয়ে রেখেছে, সে ধর্ম। সেই ধর্মকে বাদ দিয়ে যদি আমরা দেশকে বড় করতে চাই—ঠক্‌ব।

সে-অনুভূতি আজও ভারতে সত্য হ'য়ে আছে বলেই, ভারত আজও খাঁটি, আজও মহৎ।

কৃপাময়ী উঠে দাঁড়ান

কৃপা। তোমরা বসে গল্প কর বাবা, আমি যাই রান্নার যোগাড় দেখিগে।

উল্কা। আপনি নিজে হাতে রান্না করেন?

কৃপা। হ্যাঁগা। আমি যে বিধবা, আমাকে নিজের হাতেই রান্না করতে হয়। আর তা ছাড়া. সমর অপর কারু হাতে খায়না।

মিঃ চাটার্জি। উনি যে স্বামীর মৃত-আত্মার কল্যাণ কামনায় তপস্বিনী। রান্না সেই তপশ্চর্যার একটা অঙ্গ।

উল্কা। এ মিঃ ভট্টাচার্য, আপনার বড় অন্যায়।

কৃপাময়ী বেরিয়ে যান

দেখছি, আপনার মধ্যে সেই আদিম অসভ্য মানুষই প্রকট হ'য়ে আছে যে, নারীকে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়ে গর্ব অনুভব করে।

সমর। আমি সেই আদিম অসভ্য মানুষেরই বংশধর যাঁরা, এই বিরাট ভারতবর্ষে আর্য-সভ্যতা প্রচার করেছিলেন, —

ভোলা মাষ্টারের ভঙ্গীতে বলতে থাকে

যার বিরাট এবং মহৎ রূপ আজও জগতে সত্য হ'য়ে আছে। ও-দেশের সঙ্গে আমাদের এইখানেই পার্থক্য যে, আমরা নারীকে আদর্শের মধ্যে স্থাপন করি—তারা তাকে বাস্তবের মধ্যে টেনে আনতে চায়। তারা বলে এ বস্তু—

উল্কা। বস্তু তো বটেই। ঐখানেই আপনাদের উইক্‌নেস্। আমরা যে রক্তমাংসের মানুষ, তা আপনারা ঐ আইডিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করতে চান।

সমর। আপনাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিনা, করি আপনাদের বাস্তব-ধর্মকে অস্বীকার। তাই, আমাদের চাওয়ার মধ্যে যে-নারী গড়ে উঠল, সে যেন সৌন্দর্যের মন্দিরে পূজার প্রদীপের মত। সে-প্রদীপে শুধু তমই নাশ হয়না, আরতির মাঙ্গল্যও ফুটে ওঠে। সে.—নারীর কল্যাণের রূপ। এই কল্যাণময়ীকে নিয়েই ভারতের ঘর-কন্না। তাতে আমরা দুর্বল হ'য়ে যাইনি, হয়েছি সুস্থ, সবল।

তপেন। (বিরক্তভাবে ঘড়ি দেখে) ছটা যে বাজে।

উল্কা। সমস্ত ঈভিনিংটাই দেখছি আজ নষ্ট হবে।

সমর হঠাৎ আত্মস্থ হ'য়ে দাঁড়ায়

উল্কা। হ্যাঁ, কি বলছিলেন মিঃ ভট্টাচার্য! বলুন—বলুন!

সমর। ও! হ্যাঁ, আমি বলতে চাইছিলাম যে, আমরা নারীকে বসাতে চাই আদর্শের মধ্যে, আর আপনারা টেনে আনতে চান তাকে বাস্তবের মধ্যে।

তপেন। আপনার সত্য-বোধ আর তরুণবাংলার তত্ত্ববোধে একটু গরমিল হ'য়ে যাচ্ছে মিঃ ভট্টাচার্য। আপনার সত্য বাস করে ভাবুকতার ঘরে, কল্পনার মেঘ তার গা ছুঁয়ে যায়, বস্তু সেখানে পৌঁছয় না।

সমর। আমার মনে হয় আপনার প্রস্তাবে শান্তি নেই, আছে কামনার উদ্দীপনা।

নেপথ্যে কৃপাময়ী সমরকে ডাকেন

কৃপা। খোকা!

সমর। আমি আসছি মায়ের কথা শুনে।

সমর যেতে উদ্যত হয়

উল্কা। খোকা! কী উদ্ভট পরিকল্পনা!

সমর বেরিয়ে যায়

বিলেত ঘুরে এসেও মিঃ ভট্টাচার্যের গায়ে একটুও আধুনিকতার হাওয়া লাগেনি।

বই থেকে মুখ তুলে চান মিঃ চাটার্জি

মিঃ চাটার্জি। ওঁর কেরিয়ারে দেখতে পাই একটি ভাল ছেলেরই রূপ। উনি ছোট থেকে বড় হয়েছেন আপন অধ্যবসায়ে।

তপেন। আধুনিক হবার পথে অধ্যবসায়ের প্রয়োজন আছে কি ?

উল্কা। বড় হবার কোন সার্থকতাই নেই, যদি মনও সঙ্গে সঙ্গে প্রসারলাভ না করে।

মিঃ চাটার্জি। ছোট থেকে বড় হবার পথ সুগম নয়—দুর্গম। সেই দুর্গমের পথেই হয় সাধনার মোক্ষলাভ। সেই মোক্ষ উনি লাভ করেছেন, অবিরত পারিপার্শ্বিক আকর্ষণকে অস্বীকার করে, প্রবলের আক্রমণের সঙ্গে লড়াই ক'রে ; যেমন দুর্যোগ-রাতের যাত্রীকে পথ চলতে হয়, প্রকৃতির বিরূপ এলিমেণ্টস্‌এর সঙ্গে যুঝতে যুঝতে। কখন তো ঝড়ের রাতে নির্জন প্রান্তরে চলবার অসুবিধা ভোগ করনি তাই, তোমরা সেটা বুঝতে পারবেনা।

সমর প্রবেশ করে

সমর। আমি ঐ খোকা-শব্দেরই তাৎপর্য সম্বন্ধে কিছু বলব।

উল্কা মাষ্টারের সম্মুখে ছাত্রের ভঙ্গী করে বলে

উল্কা। ইয়েস্ সার—বলুন সার !

সমর। (হেসে) আমার এ কথাটা একেবারে মাষ্টারের পাঠ দেবার গৌর-চন্দ্রিকার মত শোনাল। এই একটু আগে মাকে বলছিলাম, হাকিম না হ'য়ে আমার ইস্কুল মাষ্টার হওয়া উচিত ছিল। এই মাষ্টারি ভাবটা আমি কোন মতেই কাটাতে পারিনে। কারণ, এ যে আমার রক্তের মধ্যে রয়েছে। আমার বাবা ছিলেন গ্রাম্য ইস্কুলমাষ্টার।

উল্কা। (উৎকট হাসিতে মুখভরে) এখন বুঝতে পারছি, কেন মিঃ ভট্টাচার্যের গায়ে আধুনিকতার হাওয়া লাগেনি।

তপেন। প্রিসাইস্‌লি।

সমরের মুখ চোখ রক্তিমাভা ধারণ করে

সমর। এ কথা সত্য যে, ঐ সংস্কারই আমাকে আধুনিকতার সমস্ত মোহ থেকে দূরে রেখেছে। যে কথা বলছিলাম—

উল্কা। ঐ খোকা শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে সার।

সমর। ঐ খোকা শব্দেরই মধ্যে জড়িয়ে আছে আমাদের দেশে সর্বকালের এক অপরিসীম স্নেহ-সাধনা। মায়ের স্তনের দুধ শুকিয়ে যায়, সে মুখে আর থাকেনা স্নেহের উৎস। মায়ের কোলের চেয়েও বড় হয় ছেলে, সেখানেও আর তার ঠাঁই নেই। খোকা বিপুল হতে থাকে শ্রীকৃষ্ণের বিরাটরূপের মত। মাতৃ-বাসনা তাকে কোলের আঙ্গিনাতেই ধরে রাখতে চায়। তাই মা ডাকে,—খোকা। ছেলের সেই বিরাটরূপ ঐ খোকা ডাকেই সঙ্কুচিত হয়। মাতৃকোলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্তরের সমস্ত বালকত্ব নিয়ে।

সে ঘোর কাটিয়ে এদিকে ওদিকে চায়

উল্কা। আপনি ইস্কুলমাষ্টারের মত যতই যুক্তি দিন, এতে আমাদের মন সায় দেয়না। ঐ খোকাখুকীদের মধ্যেই আমাদের দেশে বড় হবার প্রবৃত্তি নষ্ট হয়েছে।

কৃপাময়ী প্রবেশ করেন

কৃপা। খাবার সময় বোধ করি সকলেরই হয়েছে, এইখানে খেয়ে গেলেই ভাল হয়।

মিঃ চাটার্জি। আমি ত খুব রাজী। অন্ন ত রোজই জোটে, অন্নপূর্ণার সন্ধান পাইনে। আজ স্বয়ং অন্নপূর্ণার আহ্বান—

উল্কা। মেনুটা কি ?

কৃপা। এ্যাঁ !

কৃপাময়ী বুঝতে পারেন না। কিন্তু অন্তরে জ্বলে ওঠেন মেয়েটির অস্বাভাবিক স্পর্ধায়। মুখে সৌজন্যের হাসি টানবার প্রয়াস পান। মিঃ চাটার্জি কথাটিকে হাল্কা করে দিতে চান

মিঃ চাটার্জি। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে পরমান্ন ছাড়া আর কী !

তপেন। ইউ মিন্ পায়েস ?

উল্কা। ঐ খাদ্যটিকে আমার মোটে সহ্য হয়না। দুধ-ভাতেরই নামান্তর—খোকাদের প্রিয়বস্তু।

মিঃ চাটার্জি উঠে দাঁড়ান

মিঃ চাটার্জি। বেশ তো, উনি দুধভাত খেয়ে ওঁর বাজে জীবনের আবর্জনা আগলান। এ খানা তোমাদের মুখে রুচবেনা। আপনি যান, ওরা মাংসাশী—এসবের তত্ত্ব ওদের জানা নেই।

কৃপাময়ী চলে যান

তপেন। আজ যখন আর টেনিসে যাওয়া হতেই পারেনা, তখন একটা কিছু করতে হবে। মধুরেণ সমাপয়েৎ। একখানা আপনার মধুর কণ্ঠে গান শুনিয়ে দিন উল্কা দেবী। একখানা মডার্ণ—আল্ট্রামডার্ণ—

উল্কা একখানি সোফায় বসতে বসতে

উল্কা। উগ্র আধুনিকদের এক নতুন দল কলকাতায় গড়ে উঠেছে—শুনেছেন কি ?

মিঃ চাটার্জি। তুমি নেত্রী নিশ্চয়ই।

উল্কা। হ্যাঁ, একটা আন্দোলন আমরা চালাচ্ছি। যাতে করে সোকল্ড, আধুনিকতার সমস্ত সুর বদলে দিয়ে, একটা নতুন ফর্ম দিতে চাই। নাচের মধ্যেও একটা নতুনত্ব এনে, আমরা প্রাচ্য নাচের পদ্ধতিটা

বদ্‌লে নিতে চাই। তাই, নতুন নাচের একটা পরিকল্পনা আমরা করেছি।

তপেন। সেটা কী?

উল্কা। সেটা হচ্ছে এড্‌মিক্‌শ্চার অপ্‌ হুলা এণ্ড্‌ শ্যাণ্টালি।

তপেন। তা হ'লে—একটা অর্গান বা পিয়ানো—

সে চারদিকে চাইতে থাকে

মিঃ চাটার্জি। এইখানেই তোমার ভুল হ'ল তপেন। তুমি খুঁজছ গদ্যের মধ্যে পদ্যের মিল।

উল্কা। এ নাচে সঙ্গতের প্রয়োজন নেই। আমার দেহের ভঙ্গীতেই সে ছন্দ তুলতে পারব।

উল্কা নাচের জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকে। সমরের মুখে চোখে ফুটে উঠে আতঙ্কের চিহ্ন। মিঃ চাটার্জির দৃষ্টি এড়ায় না। সমর উঠে যেয়ে ভিতর-বাড়ী ও বাহির বাড়ীর সংযোগ দরজাটা বন্ধ করে দেয়। মিঃ চাটার্জি সমরের সে প্রয়াসকে সহজ করে দিতে পরিহাস করে বলেন

মিঃ চাটার্জি। সমর, তোমার এ-পরিকল্পনাটি আরও মহিমময়। উগ্র আধুনিকা ও রুদ্র প্রাচীনার মধ্যে যে-বিরোধ সূর্যাস্তকালের মত রঙীন হ'য়ে আছে, তারই উপরে তুমি টেনে দিলে মেঘের আবরণ।

নাচ আরম্ভ হয়। দু-চার পা নাচ আরম্ভ হ'তেই অবরোধের অবগুণ্ঠন মোচন করে, দরজায় এসে দাঁড়ান কৃপাময়ী। তাঁর মুখে চোখে এক উৎকট ঘৃণার ছবি

কৃপা। সমর! এ বাড়ীর অঙ্গনেরও একটা শুচিতা আছে। যা আধুনিকতার কোন পশ্চিমে হাওয়াই টলাতে পারবে না। আমার শ্বশুর ছিলেন পরম-সাত্ত্বিক-ঋষিকল্প-ব্রাহ্মণ। সেই বংশের বৌ আমি, এ সব আমাদের সয়না। এ সব ম্লেচ্ছাচার, আমি কোন মতেই আচরিত হতে দেবনা—ঐ নাচওয়ালীকে বলে দে।

সমর, তপেন, উল্কা যুগপৎ স্তম্ভিত হয়ে যায় ! মিঃ চাটার্জির কোন বৈচিত্র্য দেখা যায় না। উল্কা দৃপ্তভাবে সমরের সম্মুখীন হয়

উল্কা। সমরবাবু !

কৃপাময়ী উদ্গত অশ্রু রোধ করে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে যান। তপেন উঠে দাঁড়ায়

তপেন। মিঃ চাটার্জি !

মিঃ চাটার্জি গীতা সোফায় রেখে ধীরে ধীরে প্রশান্ত মূর্তিতে উঠে দাঁড়ান

মিঃ চাটার্জি। এতে রাগ করবার বা অপমান বোধ করবার কিছু নেই মা। ওঁদের আচারের তুলনায়, এ অনাচার। সেই কথাটাই সমরের মা পরিষ্কার বাংলায় বুঝিয়ে দিলেন।

উল্কা। অপমান নয় ?

সে কেঁদে ফেলে

মিঃ চাটার্জি। আমার বিচারে আমি তো কোথাও অপমান খুঁজে পাইনে। তোমার মতের সঙ্গে, তোমার ব্যবহার পদ্ধতির সঙ্গে আমার গরমিল হচ্ছে, সে কথা জানালে তো অপরাধ হয়না।

উল্কা। বাবা !

তপেন। এত বড় অপমান—আর আপনি—

মিঃ চাটার্জি। এ যে অপমান নয়—প্রতিবাদ, এইটাই আমি এখানে থেকে প্রমাণ করে যেতে চাই। নারীর যথার্থ শক্তিময়ী রূপ প্রত্যক্ষ করে ধন্য হ'লাম। সেই জগদ্ধাত্রীকে একবার ডাকতে হবে সমর, আমার শ্রদ্ধার একটি নতি না দিয়ে যেতে পারছিনা।

তপেন। উল্কা দেবী, আপনিও কি মিঃ চাটার্জির মত এখানে এরপরে থেকে, প্রমাণ করে যেতে চান যে, এ অপমান নয় ?

উল্কা। (ভিতর বাড়ীর দরজার দিকে অপলকে চেয়ে থেকে) আমি এর পরেও এখানে থেকে জানতে চাই, এ শক্তি তিনি কোথায় পান যা,

সমস্ত লোক-ব্যবহারের রীতিকেও মুহূর্তে লঙ্ঘন করে। ওঁদের জীবনে অভ্যস্ত নই, আমি জানতে চাই যে, কোথায় আমাদের বিরোধ সীমানা।

অবারণ অশ্রু চোখে সেইক্ষণে প্রবেশ করেন কৃপাময়ী। উল্কা অধিকতর স্তম্ভিত হয়

কৃপা। সমরের এতবড় অকল্যাণ আমি করতে পারি, কোন দিন ভাবিনি। এতবড় দুর্জয় রাগও যে আমার অন্তরে লুকিয়ে আছে, তার সন্ধানও কোনদিন পাইনি। কোথা থেকে এল এই মোহ যা মুহূর্তে আমাকে ভুলিয়ে দিলে লোক-ব্যবহারের রীতি।

তিনি উল্কার পাশে যেয়ে তাকে বুকে টেনে নেন। উল্কার কী হয়,
সে বাধা দিতে পারে না

আমায় তুমি মাপ কর।

মিঃ চাটার্জি। এই স্নেহের তিরস্কারে যদি ওর কাছে আপনাকে মাপ চাইতে হয়, তবে, আমার অপরাধ কোথায় যেয়ে পৌছয় বলুন তো ?

তপেন। কিন্তু, এই অপমান—

মিঃ চাটার্জি। অপমান ?

তপেন। উল্কা দেবীকে উনি অবলীলায় বলতে পারলেন—নাচ্‌ওয়ালী !

উল্কা ধীরে ধীরে আপনাকে মুক্ত করে শক্ত হয়ে দাঁড়ায়

মিঃ চাটার্জি। যে মেয়ে নাচে, তাকে নাচ্‌ওয়ালী ছাড়া আর কী আখ্যা দেওয়া যেতে পারে, আমায় বলতে পার তপেন ?

তপেন। কিন্তু, নাচ্‌ওয়ালীর মধ্যে যে আমাদের দেশে কুৎসিত অবজ্ঞার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে, সেইটাই আমি বলতে চাই।

মিঃ চাটার্জি। ঐ কথাটাই উনিও বলতে চেয়েছিলেন তপেন। ওইখানেই তোমাদের সঙ্গে ওঁদের বিরোধ।

কৃপা। আমি অত কথা জানিনে। আমাদের দেশে ঐ নাচ জিনিসটা আবদ্ধ আছে নটীদের মধ্যে, যাকে আমরা কোন দিনই সমাজে প্রকাশ্যে এনে স্থান দিইনি। পাড়াগাঁয়ের নিষ্ঠাপূর্ণ গণ্ডীর মধ্যে মানুষ হ'য়ে, তাদেরকে আমরা ঘৃণার চোখে দেখতেই অভ্যস্ত হয়েছি। আজ সহসা সেই আচরণ আমার অঙ্গনে হতে দেখে, সেই আজীবনের সঞ্চিত অবজ্ঞাই আমার হিতাহিত বোধের কোঠা শূন্য করে দিয়েছিল। এ আমার গোঁড়ামি। আজ আমি বুঝতে পারছি যে, আমাদেরই গণ্ডীর পাশে গণ্ডী টেনে, একদল বেরিযে যেয়ে নতুন জগত সৃষ্টি করেছে! তাদের সঙ্গে পরিচয় ছিলনা, আজ হ'ল। তাই খুকীর কাছে মাপ চাইতে আর আমার কোন দ্বিধা নেই।

উল্কা। (উল্কার চোখে স্বপ্ন-ঘোর) বাবা!

মিঃ চ্যাটার্জি। কী মা?

উল্কা। একী বাবা, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনা। ওঁর এতখানি কাঠিন্য, এতখানি উগ্র-সাধনা মুহূর্তে গলে যায় কী করে! কা সে শক্তি যা ওঁকে এই পরাজয়ের অগৌরব মাথা পেতে অবলীলায় নিতে দিলে?

মিঃ চাটার্জি। সে নারীর মাতৃত্ব মা। সে সন্ধান তো কোনদিন পাওনি। আপনার কাছে এইবার আমার কৈফিয়ত জমে উঠেছে। আমি সে-কালের সিভিলিয়ান। তখন উগ্র সাহেবিয়ানাই ছিল চল্। সেই লগ্নে এই দুটি মেয়ে এল। ছেলে পেলাম না। ছেলে মানুষ করবার অভাব-পূরণের প্রয়াস পেলাম দুটি মেয়ের মধ্যে। স্ত্রী যদিও মেমসাহেব প্রায় বনে এসেছিলেন, কিন্তু অন্তরে ছিলেন খাঁটি প্রাচীন-পংক্তি। তাঁর জীবিত কালে যে মানুষ হ'ল, সে বাইরে আধুনিকা হলেও—অন্তরে রইল প্রাচীন। তাকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি, তার জন্যে ভাবিনে। তার পর গিন্নী নিলেন বিদায়, ছোটটিকে মানুষ করবার সমস্ত গুরুভার আমার

'পরে ন্যস্ত ক'রে। মেয়ে—মানুষ করবার পদ্ধতি জানিনে, ওকে ফেলে দিলাম একটি ইংরাজী ইস্কুলের মেম্-বোর্ডিংএ। ওদের সঙ্গে আমাদের আত্মার সম্পর্ক কোথাও নেই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, এ তিরস্কারের অপরাধ তার নিশ্চয়ই জমে উঠেছিল, নইলে এ তিরস্কার কখনই কল্যাণময়ীর মুখ থেকে বেরুত না।

কৃপাময়ী ধীরে ধীরে চোখ মুছে চলে যান

সমর। মা আমার পাঁড়া-গাঁয়ের অল্প শিক্ষিতা মেয়ে। আধুনিকতার স্পর্শ তিনি পান নি।

মিঃ চাটার্জি। আধুনিকদের মনস্তত্ব আমার জানা নেই। আমার কাছে কোন কৈফিয়ত দিয়ে তেজস্বিনীর উগ্রতাকে নিস্তেজ করবার চেষ্টা পেয়োনা। যা সত্য, যা সুন্দর—তিনি তাই করেছেন।

তপেন। উল্কা দেবী, যদি যান তা হ'লে আমি আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি!

উল্কা ফিরেও চায় না, যাবারও লক্ষণ দেখা যায় না।
তার চোখে তখন অবারণ ধারা

আমি তাহ'লে চলি মিঃ ভট্টাচার্য। ১০টার গাড়ীতে আমাকে টুরে (Tour) বেরুতে হবে। গুড্ নাইট!

সে বেরিয়ে যায়। অপর দরজায় প্রবেশ করেন কৃপাময়ী, হাতে তিনখানি
খাবারের রেকাবি। পশ্চাতে কৃষ্টচন্দ্রের হাতে জল

মিঃ চাটার্জি। তপেন চলে গেছে।

কৃপাময়ী টিপয়ে খাবার রাখতে রাখতে

কৃপা। আমার অপরাধ বোধকরি তিনি মার্জনা করতে পারেন নি।

মিঃ চাটার্জি। অভাগা!

কৃপা। জানিনা খুকী মাপ করতে পেরেছে কিনা তার মায়ের অপরাধ।

উল্কা চকিতে কেঁপে ওঠে। আপনার অজ্ঞাতসারেই বেরিয়ে পড়ে

উল্কা। মা।

তার কণ্ঠ যায় উচ্ছ্বাসে ডুবে। এ দৃশ্যে মিঃ চাটার্জিরও চোখে আসে জল। তিনি রুমালে চোখ মোছেন

আমার সংশয় যে এখনও কাটেনি।

কৃপা। সে সংশয় কাটাবার ভার আমিই নিলাম মা। যদি কাটাতে পারি, তবেই তুমি আমার হবে। নইলে জানব যে, আমার আজীবনের তপস্যা হয়েছে বৃথা।

মিঃ চাটার্জি আনন্দে দুলে উঠে মেয়েকে বুকে ধরেন

মিঃ চাটার্জি। তাই হ'ক। আজ থেকে ওর পাঠ কল্যাণময়ীর আশ্রমেই আরম্ভ হ'ক। ইংরাজী ইস্কুলে পড়েছ মা, এইবার মায়ের কাছে পাঠ নেও। দেশের মেয়ে দেশের মাটির পরে মমতা দৃঢ় হবে।

মিঃ চাটার্জি কৃপাময়ীকে নমস্কার করে বিদায় নেন। সমর তাঁকে নমস্কার করে। কৃপাময়ী উল্কাকে পাশে বসিয়ে মুখে খাবার তোলেন

উল্কা। আমি তো খেতে পারব না মা।

কৃপা। আমারও যে প্রতিজ্ঞা মা, তোমাকে না খাইয়ে ছাড়ব না। তা হ'লে আমি জানব যে, আমার অপরাধ তুমি এখনও ক্ষমা করতে পারনি।

উল্কা খেতে থাকে

পিছনের জানালায় সেইক্ষণে উঁকি মারে মৃত্যুঞ্জয়

দ্বিতীয় দৃশ্য

সমরের বাংলোর বহিপ্র্াঙ্গণ। সবুজ ঘাসের লন। কোথাও বা ফুলের ঝোপ ইত্যাদি। ষ্টেজের পশ্চাদ্‌ভাগে বাইরের ড্রয়িংরুমের বহির্ভাগ। বারান্দার পশ্চাতের দেওয়ালের মধ্যভাগে দরজা, তাহাতে পর্দা লাগানো। দুপাশে দুটি জানালা। বারান্দায় একটি আলো, তারই আলোকে বারান্দার: মধ্যভাগ ও সিঁড়ির সম্মুখের লনের খানিকটা আলোকিত। বারান্দা থেকে নেমে আসে অতি জীর্ণ এক বৃদ্ধ। যেমন জীর্ণ তার দেহ তেমনি জীর্ণ তার পরিচ্ছদ

মাথার সাদা চুল অনাদরে জট পাকিয়ে মাথার চারিদিকে এলোমেলো পড়ে আছে। মুখে সেই রঙেরই ময়লা দাড়ি বুকের ওপর এসে পড়েছে। চোখের কোণে গভীর কালো রেখা। মুখাবয়বে বার্ধক্যের ভাঙ্গাচোরা রেখা গভীর ক্ষতের মত স্থায়ী হয়ে আছে। গায়ে একটি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড দোকানের ইঁদুর পোকায় কাটা লম্বা কালো কোট। পরনে মলিন ছিন্ন ধুতি। এদিকে ওদিকে চেয়ে সে লনে নেমে আসে। আপন মনে বলে

মৃত্যুন। আমার বিচারক। আমার বিচারক! হে বিচারক! আমার অপরাধের বিচার তুমি কর। আমার দেহের কালি ঘুচে যাক!

সে কী শব্দে চকিত হয়, পরক্ষণেই বাম বাহুতে মুখ ঢেকে, একটি ঝোপের পেছনে আত্মগোপন করে। অপর দিক থেকে প্রবেশ করে ঝড়ু। সে বৃদ্ধের যাবার পথে তাকিয়ে ডাকে

ঝড়ু। কুষ্ট ভাই!

প্রবেশ করে কৃষ্ণচন্দর, সাহেবের বেয়ারা

কেষ্ট। কী হইছেরে! কী হইছে?

ঝড়ু। সেই লুকোটা ফুন্ আজি আইলা। রুজ রুজ সে পড়ি যাউছি, আজি যেতে বেড়ে সে পড়ি না যায়, তাকু মু দেখিমি!

কেষ্ট। দেখবি কী?

ঝড়ু। ফাটক পরি মু চাবি পকি দিলা।

কেষ্ট। হেই ত্যাখ্! তাকে ধরেই বা হব্যে কী?

ঝড়ু। তাকু মু পুলিস্‌রু দেই দেমি।

কেষ্ট। আমি কদ্দিন ধরেই তো সাহেবকে বলছি যে, একটা চোরের উপদ্রব হয়েছে। তা, তিনি তো পেত্যই করতে চাননা। তিনি বলেন, তেনার বাড়ীতে কি চোর সেঁধুতে পারে! আর একটা মোস্কিল হয়েছে যে, নোকটা চুরির চেষ্টাটি পর্যন্ত করেনি। কেবল চোরের মত চুপি চুপি এসে, সাযেবের ঘরের ঐ জান্‌লাটির দিকে, ভ্যাব্‌লাটির মত চেয়ে থাকে। সেদিন তো পষ্ট এই লয়নে আমি দেখছি, তার লয়ন ব'যে জল পড়ছে। মনটা কী বলে জানিস,—নোকটা চোর লয়, পাগল। বোধকরি হুজুরির কাছে লালিশ জানাতে চায়।

ঝড়ু। লুকটা পগড় হয় আর বে হুয়ে, আজু তাকু মু ইমিতি ছেড়িমি নাই। গুটে শিক্ষা তাকু দেই দিমি, আউ কেত্তে বেড়ে সে আসিবি নাই।

কেষ্ট। দেখ্‌, এ:কে তো বয়স হযেছে, তার ওপর পাগল। শেষে বুড়ো মেরে কি খুনের দায়ে পড়বি?

ঝড়ু। সেদিন যেতে বেড়ে সে দৌড় দেয় কিরি পড়িছিলা, তেতবেড়ে গুটে গাছ খণ্ড পরু পড়িকি, গাছ খণ্ড ভাঙ্গি দিলা! সকাড়কু সাহেব ভাঙ্গা গাছ খণ্ড দেখি কিরি মতো পড়ি গুঁসা হইকিরি কহিলা,—গরু ছাগড় সব গাছ খাই পকিলা, আউ তুম সবে কুছু দেখিবাকু পারু নাই। কুষ্ট ভাই, তুমে এইঠি ছিড়া হই বা, মু তাকু আজু ধরিমি। বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রস্থান

ঝড়। (নেপথ্যে) কুষ্ট ভাই!

পরক্ষণেই সঙ্কুচিত বৃদ্ধকে টেনে এনে প্রবেশ করে। বৃদ্ধ হাত জোড় করে দাঁড়ায়

কেষ্ট। তুমি কে বট হে?

মৃত্যুন। আমি···আমি · অপরাধী, অপরাধী! গর্হিত সে অপরাধ, গর্হিত সে অপরাধ!

কেষ্ট। যাই বল, আর যাই কর, আমরা জানি কিসের লোভে তোমার নিত্যি আসা যাওয়া।

মৃত্যুন। (চম্‌কে ওঠে) এঁ্যা !

কেষ্ট। হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা পেড়েছ বুড়ো !

মৃত্যুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, অপরাধই আমার, তোমরা শাস্তি দেও।

কেষ্ট। জান বুড়ো, কার বাড়ীতে সিঁধকাঠি বসিয়েছ ?

বৃদ্ধ ঘাড় নেড়ে জানায়, সে জানে না

জেলার হাকিম গো ! তাঁর এক আঁচড়ে বাপ বল্‌তি দিবে না, মা বল্‌তি দিবে না। একেবারে ঘানি। চোরের—

মৃত্যুন। (কেঁপে ওঠে) চোর ! চোর ! হ্যাঁ, হ্যাঁ, চোর !

কেষ্ট। তুমি চোর !

মৃত্যুন। না না ! হ্যাঁ, আমি চোর ! চুরি…চুরি…হ্যাঁ, চুরিই আমি করেছি। কার জন্যে…কার জন্যে আজ আমি চোর—

কেষ্ট। হাকিম, জান বুড়ো হাকিম সাহেব—

মৃত্যুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঐ হাকিম সাহেব। হ্যাঁ, হাকিমই সে হল। আর অপরাধের কুণ্ঠায় কুণ্ঠিত হল সে। সেই তো আমার চাওয়া, সেই তো আমার পাওয়া—

কেষ্ট। বলছ কী বুড়ো !

মৃত্যুন। কিছু না, কিছু না।

কেষ্ট। ঝড়ু ভাই, উকে উই ফাটকের পাশে আটক রাখ। আমি সাহেবকে খবর দিঁ। আজ নিয়ে যাবই।

ঝড়ু তাকে টেনে নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। সেইক্ষণে বারান্দায় বেরিয়ে আসে সমর। এদিকে ওদিকে চেয়ে আলোর সুইস্‌ টিপে আলো জ্বালিয়ে দেয়। কাউকে না দেখতে পেয়ে সে একখানা কাগজ টেনে নিয়ে একখানি বাঁশের চেয়ারে বসে পড়ে। লন থেকে এসে কেষ্টচন্দর দাঁড়ায় জয়ের দীপ্তি মুখে নিয়ে

কেষ্ট। হুজুর!

সমর। কী তোমার নিবেদন কেষ্টচন্দর?

কেষ্ট। একটা চোর ধরা পড়েছে।

হাকিম। দণ্ড-বিধির বিধাতা জেলার হাকিম প্রবল প্রতাপান্বিত স্বয়ং সমরেন্দ্রের গৃহে চোর!

কেষ্ট। হ্যাঁ হুজুর—চোর।

সমর। কোথায় তাকে চুরি কাজে লিপ্ত দেখা গেছে?

কেষ্ট। আরও তুদিন যার কথা আপনাকে নিবেদন করেছি, তাকেই আজ আমরা ধরেছি। নিত্যি তাকে সন্দেহজনকভাবে উঁকি ঝুঁকি মারতে দেখা গেছে জানালায়।

সময়। অতি তুঃসাহসিক সেই চোর সন্দেহ নাই।

কেষ্ট। হ্যাঁ হুজুর।

সমর। কোন জানালায় তাকে সাধারণত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

কেষ্ট। বসবার ঘরের ওই জানালায়।

সমর। আশ্চর্য সেই চোর! ও ঘরে তার নেবার মত কী থাকতে পারে কেষ্টচন্দর?

কেষ্ট। ঝড়ু বলে, সে চেয়ে থাকে আপনারই মুখের পানে। আমি নিজের চোখে একদিন দেখেছি, তার চোখে ঝরছে জল।

সমর। আশ্চর্য সেই চোর কেষ্টচন্দর, আসবাবের চেয়ে মালিকের ওপরেই যার অশ্রুসজল দৃষ্টি। সেই অপূর্ব চোরের দর্শনপ্রার্থী আমি। বন্দীকে এখানে আনবার আয়োজন কর কেষ্টচন্দর।

কেষ্টচন্দরের যাবার লক্ষণ দেখা যায় না

কেষ্ট। হুজুর!

সমর। বল।

কেষ্ট। ঝড়ু বলছিল যে, হুকুম হ'লেই—

সমর। পুলিশ স্টেশনে দৌড়তে পারে ?

কেষ্ট। হ্যাঁ হুজুর।

সমর। তাহ'লে হতভাগ্যকে হুজুরে হাজির কর।

কেষ্ট লনে নেমে গিয়ে কাকে ইঙ্গিত করে

কেষ্ট। (ফিরে এসে) তাকে আনতে ঝড়ু গেছে।

সমর। কোথায় ?

কেষ্ট। ঐ গেটের পাশের ঘরটায় তাকে আটক রাখা হ'য়েছে।

সমর। হ্যাঁ। কেষ্টচন্দর, তুমি মাকে গিয়ে বল—গৃহে অতিথি। তার খাবার আয়োজন করুন।

কেষ্টচন্দরের মুখে ফুটে উঠে পরম বিস্ময়ের চিহ্ন

কেষ্ট। হুজুর !

সমর। যাও কেষ্ট। হয়তো তার সারাদিন খাওয়া হয়নি। যাও কেষ্ট।

কেষ্ট ভিতর দরজায় চলে যায়

পরক্ষণেই ঝড়ু সবিক্রমে এসে আছড়ে ফেলে বৃদ্ধকে সমরের সাম্‌নে। বৃদ্ধ লুটিয়ে পড়ে ভূমিতে মুখ থুব্‌ড়ে। সমর অপরিসীম ক্রোধে লাফিয়ে উঠে বলে

সমর। ঝড়ু !

ঝড়ু ভয়ে জড় সড়, সরে দাঁড়ায় কুণ্ঠিত ভাবে একপার্শ্বে। সমর ছুটে যায় বৃদ্ধকে তুলতে। সে নত হয়। সেইক্ষণে পশ্চাতে দরজা ঠেলে প্রবেশ করেন কৃপাময়ী বলতে বলতে

কৃপা। এত রাতে আবার কে এলরে সমু ?

সমু উঠে চকিতে ঘুরে চায় পশ্চাতে। সেই অবসরে অলক্ষ্যে উঠে দাঁড়ায় বৃদ্ধ ঝড়ের বেগে কেঁপে। সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে যায় লনের অন্ধকারের মধ্যে। সেই যাবার পথে কৃপাময়ী কিসের ইঙ্গিত পেয়ে চম্‌কে ওঠেন

ও কে !

তিনি এগিয়ে যেতে চান

সমর। ভিখারী।

কৃপাময়ীর বোধ করি মাথা ঘুরে ওঠে। তিনি ঢুলতে থাকেন।
সমর যেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে

মা!

কৃপা। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে উঠল বাবা!

চোখ তুলে অপলকে সেই অন্ধকার পথের দিকে চেয়ে বলেন

ও কে বাবা!

সমর। ভিখারী।

কৃপা। অপূর্ব ভিখারী!

যবনিকা

ইস্কুল হলের ইঙ্গিত-গর্ভ দৃশ্য

ইস্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠে। নেপথ্যে ছেলেদের কোলাহল স্তব্ধ হয়।
হেডমাষ্টার মশায় শান্ত, সৌম্য মূর্তীতে এসে হলের মধ্য ভাগে দাঁড়ায়

হেডমাষ্টার। বস বস। দেখতে দেখতে ছমাস অতীত হ'য়ে গেল। ইস্কুল গৃহের কাজ সম্পূর্ণ হ'য়েছে। যে-মহোৎসবের প্রতীক্ষায় তোমরা দিনের পর দিন অধীরভাবে যাপন করেছ, সেদিন আগত। ইস্কুল কমিটির আলোচনায় স্থিরিকৃত হ'যেছে যে, আসছে রবিবারেই সেই অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে। সকলেরই ইচ্ছা যে গ্রামের কৃতী সন্তান, এই জেলারই সেশন জজ সমরচন্দ্র, এই অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন। তাই আজই, আমি কলকাতায় রওনা হচ্ছি,—সমরচন্দ্রকে সেই মহাযজ্ঞে আমন্ত্রণ করতে। তার পুরাতন শিক্ষকের অনুরোধ সে কোনমতেই ঠেলতে পারবে না। আশা করি, তোমরা এই মহাযজ্ঞের আয়োজনে প্রাণমন নিয়োজিত ক'রে, এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলবে। দেবী ভারতীর বরপুত্র সমরচন্দ্রকে তাঁর ভাবী বর-প্রার্থীগণ যেন যোগ্য সম্মানেই সংবর্ধনা করতে সমর্থ হয়,—এই অভিলাষ জ্ঞাপন করে আমি তোমাদের কাছে বিদায় নিই। তোমরা সমাহিত চিত্তে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাও, যেন এই বিদ্যায়তন সমরচন্দ্রের মত শত শত বরপুত্রের পুণ্যাশ্রম হয়।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

হুগলীর সেশন জজ সমরেন্দ্রের গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণ। বারান্দার সম্মুখে লন।
কৃপাময়ী বসে আছেন একখানি ইজিচেয়ারে। পরনে গরদের থান। চোখে
নিকেল ফ্রেমের চশমা। কোলে খোলা আছে একখানি রামায়ণ।
পশ্চাতে দরজায় এসে দাঁড়ায় গঙ্গাজল হাতে উল্কা। পরনে
তার লালপাড় তসরের শাড়ী। আজ সে শান্ত সৌম্য,
কল্যাণময়ী। সে জল ছিটিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়।
কৃপাময়ী গলায় আঁচল জড়িয়ে দেবতার পায়
নতি জানিয়ে বলেন

কৃপা। তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়েছ মা?

উল্কা। দিয়েছি জ্যাঠাইমা।

সে চলে যায়। গঙ্গাজল পাত্র রেখে সে পুনরায় প্রবেশ করে। সে এসে
বসে কৃপাময়ীর পদতলে

তারপর জ্যাঠাইমা?

কৃপাময়ী রামায়ণ তুলে নিয়ে

কৃপা। কী যেন বলছিলাম মা?

উল্কা। সেই যে, রাজা দশরথ মন্ত্রীদের ডেকে রামের রাজ্যাভিষেকের মন্ত্রণা করতে লাগলেন। তারপর, মন্থরার মন্ত্রণায় রাণী কৈকেয়ী রাজার কাছে গিয়ে বর প্রার্থনা করলেন।

কৃপা। হ্যাঁ—

"দুইবারে দুই বর আছে তব ঠাঁই।
সেই দুই বর রাজা এইক্ষণে চাই॥
এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন।
আর বরে শ্রীরামেরে পাঠাও কানন॥

চতুর্দ্দশ বৎসর থাকুক রাম বনে।
ততকাল ভরত বসুক সিংহাসনে॥
দুরন্ত বচনে রাজা হইল মূর্চ্ছিত।
অচেতন হইলেন নাহিক সংবিত॥"

কৃপাময়ী মুখ তুলেন

উল্কা। তারপর, তারপর জ্যাঠাইমা? নারীর নিদারুণ অভিশাপে রামচন্দ্রের কি সত্যই নির্বাসন হ'ল?

কৃপা। বনেই তিনি গেলেন, রাজাদেশে নয়—

উল্কা। তবে?

কৃপা। স্বেচ্ছায়। সত্যাশ্রয়ী রামচন্দ্র—

সমর বলতে বলতে প্রবেশ করে। গায়ে পাঞ্জাবী ও চাদর। পায়ে পাম্প সু

সমর। —পিতৃসত্য পালনের জন্য বনবাসই বরণ করলেন। সমস্ত মায়ার বাঁধন এক মুহূর্ত্তে গেল কেটে, পিতাকে মিথ্যাভাষণের দায় থেকে মুক্তি দিতে। সেই তো প্রকৃত সন্তান, যে পিতাকে মুক্ত ক'রে সম্পূর্ণ করে তোলে। রামচন্দ্র সেই আদর্শ সন্তান।

কৃপা। কোর্ট থেকে এসে কোথায় বেরিয়েছিলি রে?

সমর। একটু দরকারে বেরিয়েছিলাম। মা, আজ কোর্টে এসেছিলেন আমাদের গাঁয়ের অমরনাথদা আর হেডমাষ্টার মশায়।

কৃপা। কেন রে?

সমর। তাঁরা বলতে এসেছিলেন যে,ইস্কুলের বিল্ডিং কম্‌প্লিট হ'য়ে গেছে।

কৃপা। তবে সত্যই এতদিনে ইস্কুলের বিল্ডিং হ'ল!

তাঁর চোখে নামে অশ্রুর ধারা

সমর। তাঁদের অনুরোধ যে, ইস্কুল-গৃহের উদ্‌বোধন-যজ্ঞের পৌরহিত্য আমাকেই করতে হবে। আমি বলি—আপনারা গুরুজন থাকতে আমি

কি সভাপতির আসনে বসতে পারি ? তাঁরা বলেন,—আমি যে জেলার হাকিম, তাই আমাকেই এ-কাজ করতে হবে। অগত্যা সম্মতি দিয়েছি।

কৃপা। বেশ করেছিস বাবা। ওদের কাছে আমরা চিরঋণী।

সমর। আসছে রবিবারেই উদ্‌বোধন সভা। জ্যাঠাইমার আদেশ তোমাকেও যেতে হবে।

উল্কা সমরের চাদর নিয়ে চলে যায়। কৃপাময়ী চেয়ার থেকে উঠতে উঠতে

কৃপা। যাওয়াই উচিত। কিন্তু উল্কাকে রেখে আমি কী করে যাই বল্ তো ?

সমর চেয়ারে বসে

হ্যাঁ ভালকথা, আজ চাটুজ্জে মশায়ের একখানা চিঠি এসেছে।

সমর। উল্কার জন্যে তাঁর মন কেমন করছে নিশ্চয়ই।

কৃপা। মন কেমন করবে না ? তিনি ছ'মাস হ'ল বদ্‌লি হ'য়ে গেছেন। সেই থেকে ও এইখানেই আছে। তাঁর সেই পুরনো আবেদনটাই নতুন ক'রে পেশ করেছেন। আমারও তোর কাছে সেই নিবেদন বাবা! কবে মরে যাব, বিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে ঘর-সংসার চিনিয়ে দিয়ে যাই।

সমর। তার কী প্রয়োজন মা। তার আগেই তো ও মাতৃআশ্রমের সব ভার নিয়েছে।

সমরের চটি জুতো নিয়ে প্রবেশ করে উল্কা। সমরের পায়ের তলায় রেখে পাম্প সু নিয়ে যেতে উদ্যতা হয়

কৃপা। কী যে বলিস্! পরের মেয়ে কি চিরকাল তোর ঘরে এমনিই পড়ে থাকবে ?

সমর। (হেসে উল্কার দিকে চেয়ে) মেম-বোর্ডিংএ অভ্যস্তা শিক্ষিতা-আধুনিকা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের মেয়ে, পারবে কি এই যজমানবামুন-ইস্কুল-মাষ্টারের ছেলের বধূ হ'তে ? উগ্র-আধুনিকা পারবে কি এই অসভ্য

মানুষের দাসত্ব করতে? শুধু ঘর-সংসার চিন্‌লেই তো হবে না মা, হেঁসেল শালের ইন্‌চার্জও যে হতে হবে!

সে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে। উল্কা চলে যেতে অগ্রসর হয়, কৃপাময়ী মধ্যপথে তাকে ধরেন

কৃপা। কেন? মা আমার সংসারের কোন ভারটা নেয়নি? বলুক দিকি কে বলতে পারে, আমার এ-মেয়ে কোনদিন মেমসাহেব ছিল।

উল্কা চলে যায়

সমর। তোমার হাতযশ আছে মা। ওকে সত্যিই তপস্বিনী করে তুলেছ। মাছ পর্যন্ত ছাড়িয়েছ।

কৃপা। আমাকে কথা দে বাবা।

সমর। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা মা। কোনদিন তো তার অন্যথাচরণ করিনি।

কৃপা। তবে আমি নিশ্চিন্ত।

উল্কার প্রবেশ

উল্কা জ্যাঠাইমা, আপনার আহ্নিকের জায়গা করে দিয়েছি।

কৃপা। যাই মা।

তিনি বেরিয়ে যান। উল্কা এগিয়ে এসে চেয়ারের পাশে দাঁড়ায়

উল্কা। প্রায়শ্চিত্ত তো করেছি। তবু কি কলঙ্ক মুক্ত হতে পারলাম না?

সমর। তোমার কৃচ্ছ্র-সাধনে দেবতারাও বিস্মিত হয়েছেন। হয় তো তাঁদের কাছে তোমার বরও পাওনা হয়েছে।

উল্কা। সেই দেবতারই পায়ে করি আমার বরের নিবেদন,—আমিও যাব।

সমর। সত্যিই যাবে উল্কা আমার দরিদ্র পিতার সাধনার মন্দির দেখতে? মা! মা!

আসেন কৃপাময়ী

মা! উল্কাও যাবে আমাদের সঙ্গে। মা! অমরনাথদার কাছ থেকে আজই আমাদের বাড়ীর পতিত-জমিটা কিনে নিয়েছি। সেখানে হবে আমার বাবার স্মৃতি-সৌধ—ভোলানাথ পাঠাগার।

কৃপা। বাবা!

তাঁর কণ্ঠ ডুবে যায় উচ্ছ্বাসে। তিনি চলে যান। সমর উল্কার পাশে আসে

সমর। মায়ের কাছে কথা দিয়ে তো বাগদত্ত হ'লাম। কিন্তু তোমার অন্তরের ইঙ্গিত তো পেলাম না উল্কা।

উল্কার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হয়ে উঠে

উল্কা। আমি জানিনে যাও।

সে পলায়ন তৎপর হয়। সমর তার দিকে হাসিমুখে চেয়ে অগ্রসর হয়। উল্কা এগিয়ে যায় ভিতর-বাড়ীর দরজার দিকে। সমর ছুটে যেয়ে দরজা বন্ধ করে দাঁড়ায়

সমর। উহুঁ! তোমাকে বলতেই হবে।

উল্কা হাসতে হাসতে নিরুপায়ে বাগানের দিকে অগ্রসর হয়

উল্কা। আমি বলব না।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভোলানাথ ইনিষ্টিটিউশনের একটি হল। সময় অপরাহ্ন। পশ্চাতের দরজায় প্রবেশ করে চোরের সন্তর্পণে মৃত্যুঞ্জয়। সে উঠে দাঁড়ায় মাষ্টারের বসবার উঁচু মঞ্চে। সে চেয়ে থাকে একখানি ভোলা মাষ্টারের দেওয়ালে টাঙানো ছবির দিকে। সে এদিকে ওদিকে চেয়ে নেমে আসে। দেখে কাগজের অসমাপ্ত ফুল, পাতা, শিকল পড়ে আছে। সে বসে মাটিতে। পকেট থেকে বের করে বাঁশী, এদিকে ওদিকে চেয়ে সে ফুঁ দেয়

রাধা। (নেপথ্যে) মণি !

মৃত্যুন চমকে উঠে বাঁশী লুকোয় বুকে। প্রবেশ করে রাধারাণী। ঝড়ের বেগ তার দেহে মুখে হাসি। ফুটফুটে রূপ, পরিপূর্ণ যৌবনা রাধারাণী

কে তুমি !

মৃত্যুন। আমি ? এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম ভিনগাঁয়ে, দেখি ইস্কুলে সমারোহ। ভাবি আয়োজনটা কী, দেখে আসি। শুনলাম, ইস্কুলের গৃহপ্রবেশ। তাই—দেশের ছেলে দশের একজন আসবে গাঁয়ে—

হঠাৎ রাধার কী হয়। তার চোখ ওঠে ছলছলিয়ে। সে ধরাগলায় বলে

রাধা। জান সে কে ?

মৃত্যুন ঘাড় নেড়ে জানায়, সে খবরটা তার জানা নয়

আমার সমুদা, হাকিম সমুদা।

রাধার চোখের ধারা বাধা মানে না

ভোলাজ্যাঠার ছেলে। ভোলাজ্যাঠার নাম শুনেছ ?

মৃত্যুন। না।

রাধা। তাঁর ডাক নাম ছিল ভোলা মাষ্টার। তাঁর ছেলে এই জেলারই হাকিম।

মৃত্যুন। এই জেলারই হাকিম।

তার বলবার ভঙ্গীতে গর্ব ঠিক্‌রে পড়ে। রাধা সে ভঙ্গী দেখে হেসে ওঠে। মৃত্যুন সঙ্কুচিত হয়

হাস্‌ছ ?

রাধা। মার মুখে শুনেছি—সমুদার হাকিম হবার কথায় ভোলা জ্যাঠার ঠিক-ঐ-তোমারই মত বুক উঠ্‌ত ফুলে। তিনি বুক-চিতিয়ে বলতেন,—আমার ছেলে হাকিম হবে! হাকিম সে হবেই।

মৃত্যুন। হাকিমই সে হল—না মা ?

রাধা। হাকিমই সে হ'ল।

মৃত্যুন উত্তেজনায় দুলে উঠে বলে

মৃত্যুন। আমি জানি সে হবেই। হাকিম যে তাকে হতেই হবে।

রাধা। এ কথা তুমি জান কী করে ?

মৃত্যুন। এই কথাই যে আজ সারা গাঁয়ের মুখে। তাই তো জানি মা।

রাধা। আজ সেই তিনি—

মৃত্যুন প্রোজ্জ্বল চোখে চায়

আমার সমুদা—হাকিম সমুদা আসবেন গাঁয়ে, তাই তো গাঁয়ের লোক তাঁকে অভিনন্দিত করতে ব্যস্ত হয়েছে।

মৃত্যুন। সে তো করতেই হবে। (রাধা ফিরে চায়) হ্যাঁ—সে যে সারা গাঁয়ের গর্ব।

হঠাৎ ফুলপাতা দেখিয়ে

এই দেখ মা, ওরা এগুলো ফেলে রেখে গেছে।

রাধা। কী ?

মৃত্যুন। ইস্কুল সাজাবার এই ফুল, পাতা—

সে যেয়ে অসমাপ্ত কাজ আরম্ভ করে

রাধা। না না, তোমাকে করতে হবে না। ওদের যে এখন খাবার ছুটি। এলেই শেষ করে ফেলবে।

মৃত্যুন। না না। তুমিও যাও মা, বেলা তো কম হল না। খেয়ে দেয়ে নেও গে। আমি একাই সব সেরে ফেলব। আমার তো কোন কাজ নেই মা।

রাধা। (হেসে ওঠে) তুমি সাজাবে ইস্কুল ?

মৃত্যুন। (সচকিত) কেন মা ?

রাধা। তুমি যে বুড়ো হ'য়েছ। জান কি এ সব তৈরী করতে ?

মৃত্যুন। বুড়োকে তোরা এমনি করেই বাতিল করে দিতে চাস। বুড়ো হয়েছি সত্য—যদি জানতিস—

রাধা। কী ?

মৃত্যুন। আমারই হাতে—

তার গণ্ড বয়ে জল নেমে আসে

রাধা। না না, আমি তা বলিনি। বলছিলাম—কাজ কি তোমার এত কাজে ?

মৃত্যুন। কাজ ? আরে, কাজ তো আমারই। আমার অন্তর যে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিয়ে ওঠে—

রাধা। কী ?

মৃত্যুন। (সহসা আত্মস্থ হয়ে) না ঠিক, কী বলছিলাম জান মা—ইস্কুলের সঙ্গে-যে আমার অন্তরের টান।

রাধা। সে কী ?

মৃত্যুন। অনেক দিন আগের কথা—তোরও জন্মের বহু আগে, এমনি একটা ইস্কুলের টানে আমি জড়িয়ে পড়েছিলাম। কাজ তখনও হয়নি শেষ, এমনি সময় তোর ভোলাজ্যাঠার মত ভেস্তে গেলাম। এমনি গর্হিত সে অপরাধ যে, সমাজে ফেরবার মুখ নেই। ইস্কুলের মায়াও কাটাতে পারিনে—তাই এলাম। যোগ্যতা কই যে, মন্দিরের পূজারী হই। পতিতের মন্ত্রে অধিকার নেই। এক কুষ্ঠ-রুগ্ন-লোক মন্দিরের ভেতরের

পূজায় অধিকার নেই, আছে অঙ্গনের ধূলো ঝেড়ে ধূসর হবার। সেই ধূলো ঝেড়ে ধূলো মেখে বলি,—হে অপ্রকাশ! তুমি প্রকট হও। আমার দেহের কালি ঘুচে যাক।

রাধা। এমনি তোমার কথা, যেন কত ব্যথা তোমার বুকে লুকিয়ে আছে। তুমি কে?

মৃত্যুন। পথের অপরিচয়।

রাধা। তোমার নাম নেই?

মৃত্যুন। আছে—আছে মা। আমি···আমার···

রাধা। কী?

মৃত্যুন। আমার ··আমার নাম···মৃত্যুঞ্জয়।

রাধা। মৃত্যুঞ্জয়! আহা! তোমাকে আমার বড় ভাল লাগছে। তুমি আমার মৃত্যুঙ্কা হবে?

মৃত্যুনের চোখে নামে জলের ধারা

মৃত্যুন। আমি···আমি মৃত্যুঙ্কা?

রাধাকে নেয় বুকে টেনে

তাই···হ্যাঁমা, তাই ডাকিস।

রাধাকে ছেড়ে সে দূরে সরে যায়

তুই···তুই কে মা?

রাধা। আমি যে রাধা।

হঠাৎ চমকে ঘুরে চায় মৃত্যুন। তার চোখে শতধারা

মৃত্যুন। রাধা! রাধা!

অপলকে সে দেখতে দেখতে রাধার দিকে এগিয়ে যায়

বেহালা। তোর সেই বেহালা মা?

রাধা। বেহালা? আমার ভোলাজ্যাঠার বেহালা? আমার

সমুদার হাতের তার-ছেঁড়া-বেহালা ? আমাকে উদ্দেশ করে তিনি দিয়েছিলেন মায়ের হাতে। এ-কথা তুমি জান কী করে ?

মৃত্যুন। না না, জানিনে। তবে আমারও যে একটা ছিল মা। জীবনের বহু হারানোর মত সেটিও আজ হারিয়ে গেছে মা।

রাধা। আমি কিন্তু হারাইনি। সমুদার খেল্‌না-বেহালা, ভোলা জ্যাঠার দান, আমি যত্ন করে রেখেছি তুলে। তিনি যাবার সময় মায়ের হাতে বেহালা দিয়ে বলেছিলেন—রাধাকে দিয়ো। রাধা বাজাবে আর ঠাকুরকে ডাকবে,—ঠাকুর, সমুদাকে হাকিম কর। আর বলেছিলেন—

মৃত্যুন। কী মা ?

রাধা। রাধা আমার সমুর জন্যেই রইল। সে জ্যাঠা আর নেই—

মৃত্যুন। কিন্তু তাঁর কথা তো আছে মা।

রাধা। কথার মানুষই যখন গেল—

মৃত্যুন। মানুষ গেলেও তার বাণী থাকে মা।

মৃত্যুন মাটিতে বসে

রাধা। সত্যি ?

মৃত্যুন। যা সত্য, তা চিরকালই সত্য। ভোলা মাষ্টারের পার্থিব পরিচয় হয় তো ধূলোয় মিশিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর আত্মা এই গ্রামকেই আশ্রয় করে তার কল্যাণ-কামনায় তপস্যা করছে। এই ইস্কুলের ডেস্ক, বেঞ্চি, প্রতি ধূলিকণার মধ্যে সে পেয়েছে জীবন। সে থাকবে বেঁচে প্রতি-ছাত্রের বুকে প্রভাতের শুকতারারই মতন। ভোলা মাষ্টার হারিয়ে গেছে কালের আবর্তে, কিন্তু তাঁর সেবার তো শেষ হয়নি মা। তাঁর জীবন্ত-আত্মা যেন সশরীরে ফিরছে এই ইস্কুলের অঙ্গন অবরোধের মধ্যে।

রাধা। তাই বুঝি হবে।

সে তার পাশে বসে

মৃত্যুন। তাই তো ধূলো ঝেড়ে বলি,—হে অপ্রকাশ! তুমি প্রকট হও। আমার দেহের কালি ঘুচে যাক। ঠাকুর কৈ শোনেন?

রাধা তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে

রাধা। শোনেন বৈ কী। আমার জ্ঞান হবার পর থেকে প্রতিদিন আমার পটের ঠাকুরকে ডেকেছি,—ঠাকুর, সমুদ্দাকে হাকিম কর। সে কথা তো তিনি শুনেছেন। ভক্তের ডাক তিনি শোনেন। তোমার ডাকও তিনি শুনবেন।

মৃত্যুন। বল্ মা শুনবেন?

রাধা। তিনি যে কাঙালের ঠাকুর। কাঙালের কথা আগে শোনেন।

মৃত্যুন। ঠিক, ঠিক মা। কাঙালের কথা তিনি শোনেন। আমার কথাও তিনি শুনবেন—আমার হবে মুক্তি আর তোর দুষ্মন্তের ভুলও ঘুচ্‌বে।

রাধা। দুষ্মন্ত কে?

মৃত্যুন আপন অজ্ঞাতসারেই পরিণত হয় ভোলা মাষ্টারে। পকেট থেকে ভাঙ্গা হ্যাণ্ডেলের চশমা-জোড়া বের করে নাকে এঁটে দেয়। হাত দুটি পিছনে নিবদ্ধ ক'রে সম্মুখে ঝুঁকে পড়ে। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায় মাষ্টারের উচ্চ মঞ্চে। রাধা বালিকার সারল্যে অবাক্ হ'য়ে তার মৃত্যুঙ্কার কাণ্ড দেখে

মৃত্যুন। দুষ্মন্ত! হুঁম্! দুষ্মন্ত হচ্ছে তাদেরই পূর্ব-পুরুষ যারা ছিল একদিন ভারত-কুরুক্ষেত্রের নায়ক। পুরু-বংশ-তিলক-দুষ্মন্ত ছিলেন মহাশক্তিশালী এক রাজা। একদিন তিনি মৃগয়ার্থী এসে উপস্থিত হ'লেন মালিনী-নদীর উপকূলে ভগবান কণ্বের পুণ্যাশ্রমে। আশ্রম প্রবেশ কালে মহর্ষির পালিত-কন্যা-তাপসী-শকুন্তলার রূপ-দর্শনে তিনি বিমুগ্ধ হ'লেন। গান্ধর্ব মতে দুষ্মন্তকে বরণ করে, শকুন্তলা তাঁর কুললক্ষ্মী হ'লেন। বিবাহের পর, রাজা দুষ্মন্ত গেলেন দেশে ফিরে। স্ত্রী-শকুন্তলার গর্ভে রইল তাঁর ঔরস-জাত একপুত্র। ভাবী কালে সেই-পুত্র-ভরতই হয় মহাভারতের জনক।

সন্তানকে কোলে ক'রে যেদিন পুরু-বংশ-কুললক্ষ্মী স্বামীর ঘরে এসে উপস্থিত হ'লেন, সেদিন বিস্মৃতি দুষ্মন্তের স্মৃতিকে আচ্ছন্ন করেছে। দুষ্মন্ত অপরিচিতা-এক-তাপসীকে পত্নী বলে স্বীকার করলেন না।

রাধা। তারপর তারপর? তাপসীর তপস্যা হ'ল বৃথা—সত্য পেলেনা প্রকাশ?

মৃত্যুন। হুম্! সকল সত্যের যিনি আকর, সেই মহাদেবতাই দিলেন সত্যের সন্ধান। হ'ল দৈববাণী,—সত্যাশ্রয়ী তাপসীর গর্ভে যে-সন্তান, সে হবে মহাভারতের জনক। সেই ভরতকে পালন করবার ভার শুধু তোমার একার নয় রাজন—দেবতারও। ভরত তোমারই আত্মজ বৎস। সেই দেবতারই প্রত্যাদেশে রাজার মোহবন্ধন ছিন্ন হ'ল। শকুন্তলা সপুত্র সিংহাসনে স্থান পেলে।

রাধার মনের গুরুভার অপনোদিত হয়

রাধা। ঠাকুর, তুমিই সত্য। হে মহাদেবতা, তুমিই সুন্দর।

মৃত্যুন। যে সত্য-সুন্দরের আদেশে দুষ্মন্তের বিস্মৃতি দূর হ'ল, সেই কাঙালের ঠাকুরই তোমার জ্যাঠামশায়ের কথার সত্য-রূপ দেবেন।

হঠাৎ মৃত্যুন চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি নেমে দাঁড়ায় চোখের চশমা খুলতে খুলতে চারিদিকে চেয়ে। যে এতক্ষণ ছিল ভোলা মাষ্টার, সে নেমে এল মৃত্যুঞ্জয়ের পদে

রাধা। ওমা! বেলা যে পড়ে এল। আমি যাই—

মৃত্যুন। যা মা।

রাধা। তুমি কাজ কর। তোমার খাবার আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

মৃত্যুন। না মা, আমার খাবার নিত্য যিনি জোটান, আজও তিনিই জোটাবেন মা। হ্যাঁ মা, আমার কথা কাউকে বলোনা। আমায় তো কেউ চেনেনা। আমি যে ভিন্‌গাঁয়ের ভিখারী।

রাধা। আমি যাই মৃত্যুঙ্কা।

সে চলে যায়। মৃত্যুন টেবিলে ঠেস্ দিয়ে বসে চোখ বুজে। চোখে মুখে তার স্বপ্নের ঘোর। সে ভাবতে থাকে তার অতীত দিনের ক্লাসের পাঠ দেবার কথা

মৃত্যুন। বস—বস সব। কিসের ম্যাপ্ টাঙিয়েছিস রে? ভারত-বর্ষের—হুঁম্! রোলকল হবে—তোমরা চুপ কর। অজয়, অভয়, অমিয়, অনিল, কালি,—হুঁম্! কালি আসেনি কেন? কিচ্ছু হবেনা—কিচ্ছু হবেনা। কামারের ছেলের কুমোর হবার সাধ! হুঁম্! খগেন, গোপেন, চরণ, তাপস, হুঁম্! মাথায় তেল মাখিস্‌নি কেন রে? বাপ্‌কো বেটা কুছ্ নেহি থো থোড়া থোড়া! জানিস্, ওরে জানিস তোরা—ওর বাপও অম্‌নি কোনদিন তেল মাখতনা। একদিন দিলাম মাথায় একটা গাঁট্টা। তোর বাপ এখন কোথায় রে? মুস্‌লিপট্টম! চরণ, মুস্‌লিপট্টন কোথায়? জান না? মূর্খ! হুঁম্। মুস্‌লিপট্টম দক্ষিণ-ভারতের অন্তর্গত মাদ্রাজ প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র বন্দর। হুঁম্! মুস্‌লিপট্টমের পথে যদি দক্ষিণ-ভারতেই প্রবেশ লাভ করেছি, তবে দক্ষিণ-ভারত সম্বন্ধেই আমাদের পাঠ আরম্ভ হ'ক। হুঁম্! দক্ষিণ-ভারত! দক্ষিণ-ভারতকেই বলা হয় দাক্ষিণাত্য। যে-অখণ্ড-ভূভাগ মধ্যভারতের নিম্নাংশ থেকে উঠে ক্রমাগত মহাসাগরের দিকে অবতরণ করেছে,—তার পূর্বভাগকে বলা হয় পূর্বঘাট এবং পশ্চিমভাগকে বলা হয় পশ্চিমঘাট। সেই ঘাটকে আশ্রয় করে, তারই পার্বত্য-উপত্যকার উপর গড়ে উঠেছে দুইটি জন-পদ-ভূমি। সে দুটির নাম? জীবন, রবীন, সতীশ, সমর! কী বললি? মাদ্রাজ প্রদেশ ও বোম্বে প্রদেশ। ফুল মার্কস্।

সে ঘুমে অচেতন লুটিয়ে পড়ে মাটিতে

তৃতীয় দৃশ্য

একখানি মেটে ঘরের বহির্ভাগ। দাওয়ার নিচেই উঠান ইত্যাদি। দাওয়ায় মাদুরে বসে আছে সর্বেশ্বর—বয়স এখন তার ষাটের কাছাকাছি। এসে দাঁড়ায় ছোট-বৌ উঠোনে। তাঁরও বয়স আজ বেড়েছে। সময় অপরাহ্ণ

ছোট-বৌ। সভায় যাবেনা ?

সর্বে। সভায় যাব আমি !

ছোট-বৌ। যাবেনা ? সমর আসছে গাঁয়ে, হাজার লোক গেল তাকে ষ্টেশন থেকে আনতে, আর তুমি নিশ্চিন্তে বসে আছ ? আমার সমু আসছে গাঁয়ে, তুমি তাকে আনতেও গেলেনা, দেখতেও যাবে না ?

সর্বেশ্বর। না না না। এই আমার শেষ কথা। সমর আমার কে ?

ছোট-বৌ। কে নয় শুনি ? তাকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করনি ?

সর্বে। কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি বলেই আমি যাবনা। কেন, কেন যাব বলতে পার ?

ছোট-বৌ। যাবে এই জন্যে যে, আমার একটি হারিয়ে-যাওয়া-ছেলে আজ তার মায়ের কোলেই ফিরছে।

সর্বে। মায়ের কোলের চুম্বক আর তাকে টানেনা। আজ-যে লোহার উপর পালিশের আবরণ পড়েছে।

ছোট-বৌ। তুমি মিছে দুষ্ছ সমুকে। বড়ঠাকুরের কথা হয় তো তার কানেও পৌছয়নি। আর দিদির কথা যদি বল, তাঁর জ্বালার মন ছেলেকেই গড়ে তোলবার নেশায় মেতেছে। চলবার গতি-পথে স্থিতির চিন্তা আসেনা। বন্ধনের পাশ তখন কাটিয়েই চলতে হয়।

সর্বে। তার বন্ধন-লগ্নের অপেক্ষায় থাকতে গেলে যে, আমার লগ্ন ব'য়ে যায়। সে আশায় বসে থাকতে পারব না, আমি রাধার বিয়ের যোগাড়

দেখছি—সে ভালই হ'ক, মন্দই হ'ক, আমি দেবই। সুখ-সন্ধানি বড় লোকের খেয়াল—

ছোট-বৌ। বড়লোক আবার কে ?

সর্বে। কেন সমর ? এক কথায়-যে দশহাজার টাকা দান করতে পারে, সে বড়লোকই তো। তবে এ কথাও বলব যে, এতবড় বুকের পাটা কজনের আছে ! বাপকে ঋণমুক্ত করতে পারা ভাগ্যের কথা। এমন ছেলেকে জামাই করতে পারাও ভাগ্যের কথা ছোট-বৌ।

ছোট-বৌ চোখ মোছেন

সেই ভাগ্যই যদি থাকবে, তবে এত দুঃখ আমার ঘরে ! ভোলাদাদার পুণ্যি কোথায় পাব যে, এত বড় আশা করি ! আমি আমাদের পাল্টা ঘরেই রাধার বিয়ে দেবার পাকা বন্দোবস্ত করতে, ভিন্‌গাঁয়ে ঘটক পাঠিয়েছি। দেখে নিও, বিয়ে আমি এই মাসের মধ্যেই দেব।

ছোট-বৌ। ভিন্‌গাঁয়ের পাত্রকেও জানি ঘটককেও চিনি। তাই যদি সত্য হয়, তবে বাবুদের ঐ বড়পুকুরের শীতল তলেই আমার সন্ধান করো —এ ঘরের বন্ধনে আর নয়।

সর্বে। (সাতঙ্কে) মানে ?

ছোট-বৌ। আমার রাধার পাশে, আমি সেই-ছেলেকে বরণ করতে থাকবনা। তার পূর্বে, ঐ দীঘিরই কালোজলে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরব। তুমি-যে তলেতলে নিবারণ ঘোষালের উড়ন-চণ্ডী ভাগ্নের সঙ্গে ওর বিয়ে স্থির করছ, সে কি আর জানিনে।

সর্বে। নিবারণ ঘোষালের ঐ ভাগ্নেটা খারাপ পাত্র হ'ল কোন হিসেবে ? অমন ছেলে, ঘর-বাড়ী জমি-জমা জম-জমাট। আমাদের সম-ঘর, গৌরবেই বা কম কী !

ছোট-বৌ। অগৌরব তার করতে চাইনে, কিন্তু আমার রাধার বিয়ে তার সঙ্গে হবেনা।

সর্বে। হবেনা বললেই হবেনা! মেয়ের বাপ্ আমি, চারিদিক বজায় ক'রে আমাকে চলতে হয়। কিছু হ'লে, লোকে বলবে সর্বেশ্বর চক্কোত্তির মেয়ে—তোমার নাম ভুলেও বলবেনা। সমাজের বিষচক্ষু রাবণ-চোখের আগুন-দীপ্তিতে জ্বলছে। তোমার চোখের ধারায় সে-আগুন নেবেনা।

রাখাল নেপথ্যে গলার শব্দে আগমন সঙ্কেত করে

ছোট-বৌ। (নিম্নস্বরে) রাখাল ঠাকুরপো আসছে, আমি যাই।

সর্বে। রাধাটা গেল কোথায়? কল্‌কেটায় একটু আগুন তুলে দিয়ে যাবে, সে সময়ও তার নেই। তুমি বল ঐ মেয়েকেই ঘরে পুষে রাখতে।

ছোট-বৌ। (নিম্নস্বরে) তোমার মুখের রাশ দিন-দিন আলগা হ'য়ে যাচ্ছে। আজকাল কিছুই তোমার মুখে আটকায় না।

রাখাল। (নেপথ্যে) আসতে পারি ভায়া?

সর্বেশ্বর উঠে কল্‌কে দেন ছোট-বৌয়ের হাতে, ছোট-বৌ আগুন আনতে যায়

সর্বে। এস ভায়া।

রাখাল প্রবেশ করে

তুমি আসবে তার কি সময় অসময় আছে!

রাখাল মাদুরে বসতে বসতে

রাখাল। সে-তো-বটেই সে-তো-বটেই, হাজার হলেও আমরা হলাম আপনার জন।

সর্বেশ্বর বসে ছোট-বৌয়ের উদ্দেশ্যে চাইতে থাকে

যাচ্ছি একবার ইস্কুলের দিকে। দেখে আসি ধুম-ধামটা। গাঁয়ের লোক তো একেবারে ক্ষেপে উঠেছে বললেই হয়। হাজার হ'ক ভোলা মাষ্টারের ছেলে সমর—আপনার জন।

সর্বে। আপনার-জন বলে আপনার-জন। আমার তো সন্তান বললেই হয়।

ছোট-বৌ অন্তরাল থেকে হাতছানিতে ডাকে, সর্বেশ্বর যেয়ে কল্‌কে এনে হুঁকোয় বসিয়ে রাখালের হাতে দেয়

রাখাল। যাই বল ভায়া, এ সব কিন্তু গাঁয়ের লোকের বাড়াবাড়ি।

সর্বে। বাড়াবাড়ি ব'লে বাড়াবাড়ি!

রাখাল। হাকিম কি আর দেশের লোকে হয়না?

সর্বে। হাজার-হাজার, হাজার-হাজার। কিন্তু সমুর মত হাকিম নাকি হয়না। সে তো আর যে-সে হাকিম নয়, একেবারে বিলেত পাশের হাকিম! তার নাম-ডাক, মান-মর্যাদা কত!

রাখাল। হাকিম বিলেত গেলেও হাকিম, এ দেশে হ'লেও হাকিম। হাকিমের তো আর জাতিভেদ নেই।

সর্বে। (স্তিমিত কণ্ঠে) সে কি থাকে!

কারণ এর পরে তার জানা নেই

রাখাল। তবে? বলি তবে, এমন হৈ চৈ করবার কী আছে?

সর্বে। কিছু নেই, কিছু নেই। কিন্তু সমু-যে ইস্কুলের বাড়ী দিলে, এ-একখানা-অট্টালিকা বললেই হয়। গাঁটের কড়ি খরচ ক'রে ক'জনে এমন দেয়!

রাখাল। আমি বলি কিছুই করেনি।

সর্বে। ইঁট সুরকির পাকা গাঁথুনিকেও অস্বীকার করবে! হ্যাঁ, ভোলাদার ছেলের মতনই কাজ করেছে সমর। বাপ্‌কো বেটা বটে! ইস্কুলের চালা তুললে ভোলাদা, তার গাঁথুনি পাকা করলে ছেলে। একি কম কথা!

রাখাল। কী যে বল ভায়া. তার মানে নেই!

সর্বে। কেন?

রাখাল। সময় গাঁটের কড়ি খরচ করেছে বললেই হ'ল ?

সর্বে। করেনি ?

রাখাল। করেছে ?

সর্বে। (উত্তেজিত ভাবে) আলবৎ করেছে। ঐ জ্বল্-জ্যান্ত নারকেল গাছটার মতই সত্য।

রাখাল। (হুঁকা নামিয়ে) আলবৎ করেনি। সেই বাজপড়া বাবুদের বড়পুকুরের ধারের তাল গাছটার মতই অসাড়। উত্তেজিত হ'য়ে বললেই তো কথাটা সত্য হ'য়ে যায়না।

সর্বে। তালঠুকে বললেই কিছু কথাটা মিথ্যে হ'য়ে যায়না। সত্য চিরকালই সত্য। আচ্ছা, পাঁচ হাজারের জায়গায় যে দশ হাজার দিলে, সেটার কী ?

রাখাল। সে তো দেবেই, শুভঙ্করীতেই পড়ে আছে। শতকরা বার টাকা হারে চক্রবৃদ্ধি সুদ কষলে তের বছরে কত হয়, একবার হিসেব করেছ কি ? আমার ছোট ছেলেটা আঁকে শুভঙ্করী, তাকে দিয়ে সেদিন ক'ষিয়ে নিয়েছি। তর্ক করতে মাল-মশলা চাই। সে-রসদ না-সংগ্রহ ক'রে এই-রাখালশর্মা সংগ্রামে নামে না। সেই জন্তেই তো আরও এলাম।

সর্বে। আঁকের জটিল সমস্যাটাই সভায় ক'ষে দেখাবে নাকি ?

রাখাল। রাম বল ! এলাম ছেলেটাকে নিয়ে সময়ের সঙ্গে দেখা করতে। জেলার হাকিম তাই—মানে হ'ল কি জান ভায়া, জেলার হাকিম যদি ছেলেটার একটা চাকরি-বাকরির সুবিধে ক'রে দেয়। বুঝলেনা ব্যাপারটা ?

সর্বে। বুঝিনে আর কী ভায়া। এই একটু আগে ছোট-বৌ বলছিল—যদি একটা ছেলেও থাকত—

দীর্ঘশ্বাস ফেলে

রাখাল। ভাল কথা, সময় কিছু ব্যবস্থা করলে রাধার ?

সর্বে। কিছুনা-কিছুনা। কিছুমাত্র ইষ্টি নেই।

রাখাল। থাকবে কোথা থেকে বল। ওর বাপের কিছু ইষ্টি ছিল? যদি থাকৃত, তবে ঐ ইস্কুল ফণ্ডের টাকা যা সাধারণের টাকা বললেই হয়— নিয়ে নিখোঁজ হ'তনা।

সর্বে। (রুখে উঠে বলে) রাখাল, মুখ সাম্‌লে কথা ব'ল বলছি। আমারই বাড়ীতে ব'সে আমার ভোলাদাদার নামে এতবড় অপবাদ— আমি কখন সইব না।

রাখাল। হা হা হা! কথাটা অপবাদের কোনখানটায় বিচার কর। নিখোঁজই সে হয়েছে—তবে মৃত্যুর পথে। এ কথা মানতো?

সর্বে। হক্কের কথা কে না মানবে!

রাখাল। তবে এস আমরা উঠে পড়ি। কথায়-কথায় সভার সময় হ'য়ে এল।

সর্বে। সময় কি আর আছে, এতক্ষণ হয়তো আরম্ভই হ'য়ে গেছে!

রাখাল। এস ভায়া আমরা উঠে পড়ি। আমি-যে তোমাকেই মুরুব্বি ধরেছি ভায়া। সমর তোমার কথাই শুনবে। তাই, তোমাকেই ভায়া তাকে বলে-কয়ে ছেলেটার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

সর্বে। তা যদি করে থাকতো ভুল করেছ ভায়া।

রাখাল। (সবিস্ময়ে) কেন?

সর্বে। এ-মুরুব্বির মুরুব্বিয়ানায় তোমার ছেলে—চাকরির এক ধাপেও উঠবেনা!

রাখাল। মানে তুমি বলতে চাও যে, সে তোমার কথা শুনবেনা?

সর্বে। (সাহঙ্কারে) শুনবে না! আমি বলব না!

রাখাল। সম্পর্ক ধরতে গেলে, আমার ছেলের মঙ্গল তো তোমাকেই দেখতে হয় ভায়া।

সর্বে। দেখতে হয়তো জানি—দেখবে কে?

রাখাল। কেন তুমি?

সর্বে। তুমি ভেবেছ আমি দেখব মুখ ঐ হতচ্ছাড়ার! আমি সভাতেই যাবনা।

রাখাল। সভাতেও যাবেনা ?

সর্বে। না না না, কোন লোভেই আমি যাব না। আমার কী সর্বনাশটা সে করতে বসেছে।

রাখাল। কোন্ কথাটা বলছ বল তো ? ভোলাদার চিঠিতে লেখা সেই মাসিক বরাদ্দের কথাটা ?

সর্বে। সে না দিয়ে যায় কোথায় ? সে যে ভোলাদার হাতের লেখা আদেশ।

রাখাল। ও হো হো হো! মনে পড়েছে মনে পড়েছে। যাবার দিনের সেই-কথাটা বলছ বুঝি ? ঐ রাধার বিয়ে—

সর্বে। বলব না। স্ত্রী-বুদ্ধি আর কাকে বলে! ছোট-বৌ—তাই মুখের কথাটাই মেনে নিলে। আমি হ'লে লিখিয়ে নিতাম। তখন দেখতাম, হাকিম বাবাজীর হাঁক-ডাক কত!

রাখাল। চল-চল, যেয়ে সেই-কথাটা ওকে স্মরণ করিয়ে দিলেই হবে। আমি কথা দিচ্ছি, স্বয়ং আমি কথাটা তাকে মনে করিয়ে দেব। কোন গতিকে এ-কথা সে নাও শুনতে পারে।

সর্বে। পারে তো। সে কথা সে বলে না কেন ? না না রাখাল, আমি কিছুতেই যাব না।

রাখাল উঠে পড়ে। সর্বেশ্বরও নেমে আসে উঠোনে

রাখাল। আচ্ছা, আমি চল্লাম। তাকে ধরে এখানে নিয়ে এলেই তো হ'ল।

সর্বে। আমার বাড়ীতে ?

রাখাল। হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার বাড়ী ছাড়া আর কোথায় ? চল্লাম ভায়া।

রাখাল বেরিয়ে যায়। সর্বেশ্বর চঞ্চল ভাবে পায়চারি করে

সর্বে। ছোট-বৌ! ছোট-বৌ!

ছোট-বৌ সামনে আসে। তার পরনে একখানা ফরসা শাড়ি

আচ্ছা ছোট-বৌ,সমু যদি এখানে আসে, তবে কী করব ছোট-বৌ? আমার কী আছে, কী দিয়ে তার সংবর্ধনা করব। (হঠাৎ উল্লাসে) ছোট-বৌ, ছোট-বৌ—আমি বলছি তার ছোট-খুড়োর বাড়ীতে-সে না-এসে পারবে না।

ছোট-বৌ। সে আসবেই—আমি তাকে আনবই। এস।

সর্বে। কোথায়?

ছোট-বৌ। সভায়।

সবে। সভায় আমি কিছুতেই যাব না। আমি চল্লাম ভিন্‌গাঁয়ে, ছেলে দেখে আজই বিয়ে পাকা ক'রে আসব। আমি ওকে দেখিয়ে দেব, তার খুড়ো গরীব—কাঙাল নয়।

ছোট-বৌ। তাই যাও। মেয়েটার যাহ'ক করে বিয়ে দিয়ে দেও। আমিও বাঁচি, তুমিও নিশ্চিন্ত হও।

সর্বে। বিয়ে দেব তোমার হুকুমে নাকি?

ছোট-বৌ। তবে সভায় চল?

সর্বে। না না না, সভায়-আমি যাব না। তুমি যাবে না, রাধা যাবে না—এ বাড়ীর কেউ যাবে না।

বলেই সে মহাগম্ভীর ভাবে পায়চারি করতে থাকে।

প্রবেশ করে রাধারাণী ঝড়ের বেগে

রাধা। মা! মা! শাঁক বাজাও। শাঁক বাজাও।

ছোট-বৌ। কেন লো?

সর্বেশ্বর পরম বিস্ময়ে চাহে। রাধা গালে হাত দিয়ে বলে

রাধা। ও আমার পোড়াকপাল! একথাও আজ বুঝি শোননি যে, সমুদার যাবার পথে প্রতি-ঘরে-ঘরে শঙ্খধ্বনি-হুলুধ্বনি করতে হবে!

ছোট-বৌ। এই পথেই আসবে বুঝি ?

রাধা। আসবে না ? এই যে তাঁর বাড়ীর পথ।

ছোট-বৌ। হ্যাঁরে! বড়-বৌ, তোর জ্যাঠাইমা এসেছে ?

রাধা। এসেছেন। অমরনাথদা শিবনাথদা সকলে প্রণাম করলেন। তিনি চোখের জলে ভেসে সকলকে আশীর্বাদ করলেন। সকলে বললে— সমুদার মা। তিনিই তো আমার জ্যাঠাইমা ? আমার বয়সী একটি মেয়েও এসেছে মা।

ছোট-বৌ। তুই প্রণাম করলি তোর জ্যাঠাইমাকে ? তোকে চিনলে ?

রাধা। (রাধার চোখের কোণে জল গড়িয়ে পড়ে) আমাকে কেউ চেনে না। আমি পালিয়ে এলাম।

সর্বেশ্বর ধীরে ধীরে কাছে এসে বলে

সর্বে। কিসে চড়ে আসছে সমু ?

রাধা। গাঁয়ের ছেলেরা বললে—তাদের ঘাড়ে চড়ে আসতে হবে। সমুদা রাজী হ'লেন না। অমরনাথদা বললে—চার ঘোড়ার গাড়ী এনেছি। সমুদা বলে—আমার গাঁয়ে আমার মায়ের স্পর্শ পাব না, সে কি হয় দাদা ? অমরনাথদা গোঁ ধরে বলেন—তুই কি ক্ষেপলি সমর ? আমাদের এলাকায় জেলার হাকিম কোনদিন হেঁটে যায়নি—বাবার নিষেধ ছিল। অগত্যা সমুদাকে চাপতেই হ'ল।

সর্বে। চার ঘোড়ার গাড়ী চড়ে আমার সমু যায় চন্দনপুরের বুকের পরে !

দূরে গড়ের বাদ্য শোনা যায় আর ছেলেদের জয়ধ্বনি। রাধা পুলকে দুলে উঠে

রাধা। ঐ আসছেন—আমি যাই।

সর্বে। (সাহঙ্কারে) যাই ! শাঁক আনবে, হুলুধ্বনি দেবে কে ?

রাধা। ও শাঁক।

সে ছুটে যায় ঘরে, নিয়ে আসে শাঁক জলে ভিজিয়ে। বাস্ত নিকটে আসে

মা শাঁক নেও।

সর্বেশ্বর ছুটে যেয়ে তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় শাঁক। সে শাঁক বাজাতে থাকে। ছোট-বৌ ও রাধা যায় সদরে হুলুধ্বনি দিতে দিতে। বাস্তধ্বনি দূরে মিশিয়ে যায়। ছোট-বৌ, রাধা ফিরে আসে। সর্বেশ্বর শাঁক দাওয়ায় রাখে

সর্বে। ওরে রাধা, ও ছোট-বৌ! তোমরা দেরি করছ কেন—যাও।

ছোট-বৌ। কোথায়?

সর্বে। কেন সভায়! আমার সমু হবে সভাপতি, একথাও আজ জিজ্ঞাসা করতে হয়?

রাধা। বাবা! তুমি যাবে না?

সর্বে। না না না, কতবার বলব যে—যাব না। আমার না-যাবার খবর সারা গাঁয়ের লোক জানলে, এতক্ষণ হয়তো সমরও শুনলে, আর শুনলে না শুধু আমার বাড়ীর লোক! আমি যাব না। কিছুতেই যাব না। তোমরা যাও না।

ছোট-বৌ রাধার হাত ধরে বেরিয়ে যায়। সর্বেশ্বর অস্থিরভাবে পদচারণ করে

যাব না—না, কিছুতেই না।

সে যেয়ে বসে দাওয়ায় মাদুরে

উহুঁ, কিছুতেই যাওয়া হবে না।

সে আবার উঠে। নিজের অজ্ঞাতসারেই চাদরখানা কাঁধে ফেলে, লাঠি গাছা হাতে নেয়। দাওয়ার কোণ থেকে চটি জোড়াও পায় দেয়। সে নেমে আসে উঠোনে।

প্রবেশ করে বেগে রাধারাণী

সর্বে। (সাতঙ্কে) কে!

রাধা অবাক হ'য়ে গালে হাত দিয়ে বাবার কাণ্ড দেখে

ও! তুই ভেবেছিস আমি বুঝি যাচ্ছি সভায়? না না না—কখন না। যাই, নদীর ধারটায় বেড়িয়ে আসি।। তুই যে ঘুরে এলি?

রাধা ছুটে যায় ঘরে। একছড়া ফুলের মালা নিয়ে আসে। ধীরে ধীরে অশ্রুসজল চোখে যেয়ে বাবার হাত ধরে

রাধা। বাবা, তুমি সত্যিই যাবে না ?

সর্বেশ্বর ঝুঁকে প'ড়ে রাধার চোখ দেখেন। আপন কোঁচায় তার চোখ মুছিয়ে দিয়ে

সর্বে। যাব না! নিশ্চয়ই যাব। ভোলাদা নেই। তাঁর জায়গায় আমাকেই তো যেতে হবে। মালা আমায় দে। আমি পরিয়ে দেব তার গলায়। ওরে রাধা—চল্-চল্-চল্ !

তিনি রাধার হাত ধরে এগিয়ে চলেন

চতুর্থ দৃশ্য

ইস্কুল হলটি পত্রপুষ্পে সজ্জিত। গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে সভা বসেছে। সভাপতির আসনে সমর, তাহার একপাশে হেডমাষ্টার ও অমরনাথ। সভাপতির পিছনে লাল পাগড়ী মাথায় বেঁধে দাঁড়িয়েছে বৃন্দাবন। একপাশে চিক দিয়ে মেয়েদের আসন নির্ধারণ করা হয়েছে। সভাগৃহ ছাত্র ও অভ্যাগতে পরিপূর্ণ। দৃশ্যটি দেখবার পূর্ব হতেই সভার কাজ আরম্ভ হ'য়েছে। সময় অপরাহ্ন

হেডমাষ্টার। যাঁর অপূর্ব আত্ম-ত্যাগ, একনিষ্ঠ সেবা ও তপস্যা সমস্ত বিরূপ অবস্থার সঙ্গে সংগ্রামে জয়লাভ ক'রে, এই ইস্কুলকে নিত্যতা দান করেছে—তিনি আমাদের চিরপরিচিত ভোলা মাষ্টার। যে-দেবী সেদিন ছিলেন বন্ধ্যা—আজ তিনি পুত্রবতী। সে-পুত্র আজ এসেছে, যে-তাঁকে সমস্ত ব্যর্থতা ও অসমাপ্তি থেকে দেবে মুক্তি। সমরচন্দ্রের মধ্যে আমরা সেই পুত্রেরই সন্ধান পেয়েছি।

করতালি

জ্ঞানে, ভাবে, কর্মে সে শুদ্ধ নিজেকেই গৌরবের শিখর স্থানে স্থাপন করেনি, তার সঙ্গেসঙ্গে তুলেছে এই গ্রাম-মাতাকেও তার যোগ্য-স্থানে। কিন্তু, এ

যজ্ঞের পুরোহিত কে? সে ঐ ভোলা মাষ্টারের দল। তারাই দেশে-দেশে কালে-কালে জ্ঞানের, ভাবের, কর্মের প্রেরণাকে প্রসার ক'রে, তাকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে। তাদের স্বতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা নেই, তারা ছাত্রের গৌরব-সমৃদ্ধির মধ্যেই চিরন্তন হ'য়ে থাকে। সেই গৌরবেই তাদের আনন্দ। সেই-আনন্দে ভরপুর আমার মন। আমারই ছাত্র সমর শুদ্ধ আই, সি, এসই নয়, সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ট্রিপ্‌ল্ এম, এ—সংস্কৃত, ফিলজপি ও পালি বিষয়ে। সে-আজ জেলার হাকিম —দশজনের একজন। বৃহৎ-সভায় উঁচু আসনের অধিকারী। আমরা সাধারণ-জনতার অপরিচয়। কিন্তু, আমি তো ক্ষুদ্র নই। ওই যে আমি মহিমান্বিত হ'য়েছি সমরের মধ্যে। কে দিল ওর উদ্দীপনা, কার অধ্যাপনায় আজ ও সভাপতি? আমি। ভোলা মাষ্টারের দল হারিয়ে যায়। উত্তরকালে, তারই মহিমা বহন ক'রে চলে ঐ সমরের মত অসংখ্য-ছাত্র। সে হারিয়ে গিয়েও হারায় না, ফুরিয়ে গিয়েও ফুরোয় না—সে শাশ্বত হ'য়ে থাকে তার ছাত্রের মধ্যে। আজ এই বিদ্যা-মন্দিরের পাকা-গাঁথুনির মধ্যে যে-দেবীকে পাকা করবার উৎসব চলছে, সেই দেবীর পায প্রার্থনা জানাই—এই শিক্ষায়তনের মধ্যে অসংখ্য ভোলা মাষ্টারের অধ্যাপনায় বাঙালির গৌরব, বাঙালির কীর্তি, বাঙালির চরিতার্থতা কালে-কালে সমপ্রাণ হ'য়ে উঠুক। অন্তরের এই কামনা প্রকাশ ক'রে আমি আসন গ্রহণ করি।

করতালি ও হুলুধ্বনিতে গৃহ মুখরিত হ'তে থাকে। হেডমাষ্টার আসন গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে শান্ত, সৌম্য-মূর্তি সমর উঠে দাঁড়ায়। হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, জয়ধ্বনি উত্থিত হয়। সমর এক-একজনকে সম্বোধনকালে নমস্কার করে। সর্বেশ্বর প্রবেশ ক'রে সমরের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে বসে

সমর। আচার্য, গুরুজন, মাতৃজন, কল্যাণীয় ভ্রাতা ও ভগ্নী! যাঁর আহ্বানে আজ আমি এখানে এসেছি, তিনি আমার পুণ্যবতী, স্নেহ-বৎসলা, শস্য-শ্যামা—পল্লী-লক্ষ্মী। বন্দেমাতরম্!

জনগণ কণ্ঠে উচ্চারিত হয় মাতৃ-বন্দনা

তাঁকে বন্দনা ক'রে আমি বলতে চাই, সভাপতির যোগ্য-পদ যোগ্যতর ব্যক্তির 'পরে ন্যস্ত হ'লেই আমি অধিক আনন্দ লাভ করতাম। যাঁদের অনুরোধে আমি এ-পদ গ্রহণ করতে বাধ্য হ'য়েছি, তাঁরা আমার মান্য-ব্যক্তি। তাঁদের আদেশের অন্যথাচরণে আমি ভয় পাই। তাঁরা বলেন—আমি নাকি যোগ্যতম ব্যক্তি। কিন্তু, প্রশ্ন করি, সন্তান যোগ্যতম হ'লেও কি তার স্থান পিতৃস্থানিয়দের পদতলেই নয়?

করতালি

তবুও, আমি না-বলতে পারিনি এই জন্যে যে, যে-মন্দিরের আজ উদ্বোধন, তার সঙ্গে আমার নাড়ীর টান। সে-মন্দিরের উদ্বোধন আমার সৌভাগ্য। আজ যা-কিছু আমি হ'য়েছি, সে এই মন্দির-লক্ষ্মীর আশীর্বাদেই। সেই মন্দির-লক্ষ্মীর আশীর্বাদ মাথায় ধরে, যে-কাজ একদিন আমার পিতার হাতে অসম্পূর্ণ ছিল, তাকেই পরিপূর্ণ করতে পেরে আমাকে ধন্য-বোধ করছি! ষোল বৎসর পূর্বে, এক সর্বনাশা-ঝড় আরব্ধ-কার্যকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল। সংসারে শুভ-কর্ম সব সময় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়না। বিঘ্নই অনেক সময়ে শুভ-কর্মের কর্মকে রোধ ক'রে, শুভকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে। সেই আমাদের সান্ত্বনা। আজ আমাদের খোড়ো চালার পরিবর্তে গ্রাম্য-ইস্কুলের পাকা গাঁথুনির ইমারত হ'য়েছে। তার উদ্বোধনের সঙ্গে আমাদের চিত্তেরও দ্বারোদ্ঘাটন হ'ক, এই আমার কামনা। তার বাঁধা-অঙ্গনে তারই গৌরব মাথায় ক'রে ভাব-নৃত্যের অনুবর্তিতায় আমাদের মুক্তির পথ খোলসা হবেনা। এই অঙ্গনের পাঁচিল পেরিয়ে ঐ-যে-পথের রেখা গেছে এঁকে-বেঁকে গ্রামের ঘনবনের ফাঁকেফাঁকে, তারপরে ঐ-যে-পাকাধানের ক্ষেত দিগন্তে হ'য়েছে বিলীন, ঐ দিগন্তের পানেই আমাদের ছুটতে হবে অশ্বমেধ-যজ্ঞের মুক্ত-অশ্বের মতন।

"ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাত কালে, এ জাগ্রত-ভবে
এই কর্মধামে। তুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্মে বাধা, গতি-পথে বাধা,
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ।"

তাই মন্দির গড়লেই হবেনা, মন্দিরের পূজারী হতে হবে। তাঁর পূজার নির্মাল্য মাথায় ধরে গ্রামের গণ্ডী পেরিয়ে, বেরিয়ে আসতে হবে মহাগ্রামের মুক্ত-প্রাঙ্গণে। সে-প্রাঙ্গণ আমার সুজলা-সুফলা-বাংলা-মাতার প্রসারিত অঞ্চল।

বন্দেমাতরম ধ্বনি উত্থিত হয়

মন্দিরে নৈবেদ্য-সংগ্রহের ভার যাদের উপর ন্যস্ত, সেই ছাত্রগণকে বলতে চাই—হে অরুণ-সারথি, দেশের সুপ্তি-জাল-জড়তা হরণ ক'রে তোমার জন্মভূমি দেশকে তার পথ-নির্দেশ কর। সেই ভার তোমাদের উপর সমর্পণ ক'রে, আমি মন্দিরের দ্বার-বাতায়ন উন্মুক্ত করি। অরুণ-কিরণের নবচ্ছটা এর অন্তরের সমস্ত জড়তা দূর ক'রে তাকে উজ্জ্বল করুক। তাকে জাগ্রত করুক সেই-স্বর্গে—

"চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণ-তলে দিবস শর্বরী
বসুধারে রাখে নাই ক্ষুদ্র খণ্ড করি।"

সমর আসন গ্রহণ করে। হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, জয়ধ্বনিতে গৃহ মুখরিত হয়।
সমর, হেডমাষ্টার ও অমরনাথের সঙ্গে সামনে এগিয়ে আসে।
বৃন্দাবন ও অকিঞ্চন এসে দাঁড়ায়

বৃন্দা। আমাকে চিনতে পার বাবা?

সমর। আমার ইস্কুলের বৃন্দাবনকাকাকে ভুলে যাব, এত বড়ই কি বড় হ'য়েছি বৃন্দাবনকাকা?

সমর পকেট থেকে দুখানা দশ টাকার নোট বের ক'রে বৃন্দাবনের হাতে দেয়

এই আমার সেলামি বৃন্দাবন কাকা।

বৃন্দা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

বৃন্দাবন ও অকিঞ্চন চলে যায়

অমর। আজ রাতে এইখানেই থাকবে তো? আমার বাড়ীতেই তোমাদের থাকবার সব বন্দোবস্ত হ'য়েছে।

সমর। জ্যাঠাইমাকে বলবেন—কাল সকালে তাঁর প্রসাদ পাব। মায়ের ইচ্ছা, রাত্রে ছোটখুড়ীর ওখানে থাকেন।

অমর। সেই মেটেঘরে কি তুমি থাকতে পারবে ভায়া? তোমরা হ'লে সাহেব মানুষ—

সমর। সাহেব আবার কবে হ'লাম! দেশের যা-কিছু-পুরানো সব যে বেঁধে রেখেছি এই শিখাতে অমরদা!

সে গর্বভরে শিখা দেখায়

অমর। আমি-যে-আবার বড়-পুকুরটায় জাল ফেলিয়ে একটা কাতলা মাছ ধরিয়ে রেখেছি।

সমর। মাছ তো আমি খাইনে অমরদা।

অমর আকাশ থেকে পড়ে

অমর। আরে, মাছ খাওনা, বিলেতে তো মাংস খেয়ে এলে?

সমর। স্ব-পাকের খিচুড়ি আর দুধভাত খেয়ে দিব্য বছরখানেক কাটিয়ে দেওয়া গেছে। ও-সবের ধার দিয়েও যাইনি।

অমর। এঁ্যা! সমর বলে কি হেডমাষ্টারবাবু!

হেডমাষ্টার। ও যে ভোলামাষ্টারের ছেলে—বাপের গোঁ যাবে কোথা?

সেইক্ষণে কে ডাকে মেয়েলী কণ্ঠে

রাধা। সমুদা!

সমর ফিরে চায়। হেডমাষ্টার ও অমরনাথ তাকে সেই বিস্ময়ের ঘুরপাকে। ফেলেই চলে যেতে উদ্যত হয়

অমর। আমরা তাহ'লে এখন চল্লাম ভায়া। কাল সকালে কিন্তু না গেলে মা বড্ড দুঃখিত হবেন।

সমর। আপনাদের কৃপার কথা, বিশেষ ক'রে জ্যাঠাইমার স্নেহ কোনদিনই ভুলতে পারবনা।

সমর তাঁদের পদধূলি নেয়—তাঁরা বেরিয়ে যান। সমর অগ্রসর হয় দরজার দিকে। প্রবেশ করে রাধারাণী। লজ্জানতা রাধারাণী। রাধারাণীকে দেখে সে বিব্রত হ'য়ে উঠে। সমর এক অপরিচিতা যুবতীকে কী বলে সম্বোধন করবে ভেবে পায় না। সেইক্ষণে সমস্ত আচ্ছন্নতার কুয়াশা কাটিয়ে দিয়ে আসেন ছোট-বৌ বলতে বলতে

ছোট-বৌ। ওযে আমার মেয়ে রাধা।

সমর ছোট-বৌএর পরিণত বয়স ও রাধার যুবতী মূর্তি-সন্দর্শনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে থাকে। হঠাৎ চেতনা পেয়ে সে ছোট-খুড়ীর পদে প্রণত হয়। আর হয় রাধা সমরের পদে। ছোট-বৌ তার চিবুক স্পর্শ ক'রে বলেন

ওকে তুমি বড্ড ছোট দেখেছ, তাই ওর চেহারা তুমি ভুলে গেছ। এমনি ক'রেই ভুলে থাকতে হয় বাবা!

সমর। না ছোট-খুড়ীমা—

ছোট-বৌ। কৈফিয়তে নিজেকে কুণ্ঠিত কোরোনা বাবা। জানিতো, মরণবাঁচনের সংগ্রাম ক'রে যাকে পথ চলতে হয়, পিছু চাইবার তার অবকাশ থাকেনা।

অপলকে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাকে রাধা সমুর মুখের পানে

ওরে রাধা, হাঁ ক'রে দেখছিস শুধু। তোর সমুদার সঙ্গে কথা বল্!

সেইক্ষণে পশ্চাতের দরজায় প্রচ্ছন্নভাবে এসে দাঁড়ায় মৃত্যুঞ্জয়

ওকি আজ হাঁ-ক'রে দেখছে জান সমু? ও দেখছে, ওর অতীতকালের সাধনার সমুদা, ভাবীকালে কেমন হ'য়েছে। ওর প্রতিদিনের পটের ঠাকুরের সামনে সমুদাকে হাকিম করবার কাকুতি যদি শুনতে!

তিনি চোখ মুছে বলেন

এ-তোর সেই-হাকিম সমুদা!

রাধার সঙ্গে প্রচ্ছন্ন থেকে মৃত্যুঞ্জয় সমরের হাকিম রূপ দেখে। মৃত্যুঞ্জয়ের মুখ আনন্দ-দীপ্তিতে ভরে উঠে। মৃত্যুঞ্জয়ও বুকের ভেতর থেকে বার করে বাঁশীটি. বুকে ধরে সে কাঁপতে কাঁপতে লুটিয়ে পড়ে সেই প্রচ্ছন্নতার অন্ধকারে

সমর। রাধার বিয়ের আয়োজন করছেন খুড়ীমা?

ছোট-বৌ। (ঢোঁক গিলে বাধ বাধ স্বরে) বিয়ে? হ্যাঁ, বিয়েরই যোগাড় উনি দেখছেন।

সমর। টাকা যা লাগে আমাকে লিখবেন। আমি দেব।

ছোট-বৌ। টাকার বিশেষ দরকার নয়, এমন বর অনেক আছে। সম্প্রতি উনি একটি ছেলে দেখেছেন—আমাদের গাঁয়ের নিবারণ ঘোষালের ভাগ্নে।

সমর। কী করে?

ছোট-বৌ। সখের যাত্রা দলের হনুমান। গাঁজার মাতন বেশী বলে, আমি আপত্তি তুলেছিলাম। অমন ছেলেই তো আমাদের ঘরে বেশী—জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট কোথায় পাব? তাই, আমি মত দিয়েছি।

ঝড়ের বেগে কম্পমান দেহে মৃত্যুঞ্জয় উঠে দাঁড়ায়। তার দেহে নটরাজের উন্মাদনা। মৃত্যুঞ্জয় তীব্র-কণ্ঠে বলে উঠে

মৃত্যুন। (নেপথ্যে) না না না !

মৃত্যুঞ্জয় শরবিদ্ধ হরিণের মত সেই অন্ধকারের মধ্যেই মিশিয়ে যায়। তাকে কেউ দেখে না, কিন্তু তার কথার প্রতিধ্বনি আসে। সমর সবিস্ময়ে ঘুরে চায়

রাধা। আমার মৃত্যুঙ্কা।

ছোট-বৌ। গাঁয়ে এল এক-ভিখারী-পাগল। পাগল কোথা-থেকে শুনেছে যে, বড়ঠাকুর যাবার সময বলে গিয়েছেন, রাধা আমার সমুর জন্যেই রইল।

নেপথ্যে কৃপাময়ী

কৃপা। সমর !

রাধার প্রস্থান

কৃপাময়ী ও উল্কা প্রবেশ করেন

ছোট-বৌ। রাধা সমুরই হবে।

কৃপাময়ী কেঁপে উঠে উল্কাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন

সমর। এ কথা কি সত্য মা যে, বাবার ঐ ছিল শেষ-আদেশ ?

কৃপা। সমর !

ছোট-বৌ। দিদির জ্বালার মন, ছেলেকে গড়ে তোলবার নেশাতেই ছিল ভরপূর।

কৃপা উল্কাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে উচ্ছসিত কণ্ঠে

কৃপা। যাবার সময় উনি পটের ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে ছোট-বৌকে উদ্দেশ ক'রে বলেছিলেন—রাধা আমার সমুর জন্যেই রইল।

উল্কার চোখে জল গড়িয়ে পড়ে। সে ভয়ে কাঁপতে থাকে, কৃপাময়ী তাকে জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে যান। সমর স্তম্ভিত ভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে

ছোট-বৌ। ও নিয়ে তুমি ভেবনা বাবা। সে-মানুষও নেই, সে-কথাও আর নেই, এস।

তিনি তার হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে যান। উৎফুল্ল পদবিক্ষেপে
বাঁশী বাজিয়ে প্রবেশ করে মৃত্যুঞ্জয়

মৃত্যুন। সমর! এই আমার হাকিম সমর। আমার কল্পনার শিশু-হাকিম-সমর আজ সত্যিকারের বিচারক। আমার সমর, আমার রাধা মা—আমার এক সুখের সংসার। পতিতের তো সে-সুখের সংসারে প্রবেশ অধিকার নেই! তবে?·· তবে? হে বিচারক! তুমি আমাকে প্রকাশ কর···আমার দেহের কালি ঘুচে যাক।···

সে লুটিয়ে পড়ে একখানি বেঞ্চিতে

ঝড়ের বেগে প্রবেশ করে রাধা

রাধা। ও! মৃত্যুঙ্কা! একা—

মৃত্যুন। এস মা।

রাধা এগিয়ে যায়। তার হাত ধরে

আমি বলছি মা। দুষ্মন্তের বিস্মৃতি কাটবে। পিতৃসত্য-পালনের জন্য শ্রীরামচন্দ্র বনবাস-বরণ করেছিলেন। পিতাকে মিথ্যাভাষণের দায় থেকে উদ্ধার করতে, তোমার সমুদা কখনই তোমাকে অস্বীকার করবেনা। উমার রুদ্র-তপস্যাই শংকরকে বরণ করবার শক্তি দিয়েছিল। আমি বলছি মা, তোমার সাধনাও বিফল হবেনা।···

রাধা। আমি যাই মৃত্যুঙ্কা—আমার অনেক কাজ···

মৃত্যুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি যাও মা।···আজ-যে স্বয়ং-শংকর তোমার দ্বারে অতিথি।

রাধা আপনাকে মুক্ত করে অগ্রসর হয়। মৃত্যুন আপনার সঙ্গে দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়। সে
কাপড়ের ভিতর থেকে একখানি ভাঁজ করা কাগজ বের করে
কী ভাবে। পরক্ষণে ডাকে

মা!

রাধা ফিরে চায়

একটা কথা মা।

রাধা। কী মৃত্যুঙ্কা ?

মৃত্যুন। (ভয়ে ভয়ে চিঠিখানা সম্মুখে ধরে) এই চিঠিখানা—

রাধা। (সবিস্ময়ে) কিসের চিঠি ?

মৃত্যুন। (সচকিতে) চিঠি—হ্যাঁ, এ চিঠি ঠিক নয়···তবে···এ আমার হাকিমের দরবারে আরজি।···হে অপ্রকাশ ! আমাকে প্রকাশ করবার শক্তি তুমি দেও।

সে থেমে যায়

রাধা। কিসের আরজি ?

মৃত্যুন। আরজি···আরজি···আমার নিবেদন ! হে বিচারক !

রাধা। ও ! সদর হাকিমের কাছে সাহায্যের প্রার্থনা ?

মৃত্যুন। হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক তাই।

রাধা খুশীর সঙ্গে চিঠিখানা বুকের ভেতর ফেলে দিয়ে যেতে উদ্যত হয়। মৃত্যুন অস্থির চাঞ্চল্যে ডাকে

মা !

রাধা ফিরে চায়

না না, আমার বড় ভয় হয়। তাঁকে দিয়োনা। সে যে বিচারক—আর আমি···হে অপ্রকাশ ! তুমি প্রকট হও।

রাধা। না, না, তোমার কোন ভয় নেই। তিনি সদরে হাকিম, কিন্তু গ্রামের-যে-তিনি ভোলাজ্যাঠার ছেলে সমু !

মৃত্যুন। (আপন মনে) সমু !···সমু !···আমার বিচারক।

রাধা। মৃত্যুঙ্কা !

মৃত্যুন। কী মা ? ও ! হ্যাঁ হ্যাঁ,···এ তুমি তোমার হাকিম সমুদার মাকে দিয়ো—

রাধা। আমার জ্যাঠাইমাকে ?

মৃত্যুন। হ্যাঁ হ্যাঁ মা—তাঁকেই আমি লিখেছি।

রাধা চলে যায়। মৃত্যুন ধীরে ধীরে অশ্রু সজল নিমীলিত চোখে বাঁশী বের করে বুকে ধরে

সমু! আমার খোকা! আমার বিচারক! হে বিচারক! আমার অপরাধের বিচার তুমি কব।

সে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে লুটিয়ে পড়ে ভূমিতে

পঞ্চম দৃশ্য

সর্বেশ্বরের গৃহাঙ্গন। উঠানে ছোট-বৌ উল্কার সঙ্গে প্রবেশ করে। সময় সন্ধ্যা

ছোট-বৌ। এমনি সমরের কত কী খুঁটিনাটি, আজও রাধার সঞ্চয় হয়ে আছে। সে একটি জিনিষও ফেলতে দেয়নি, পরম যত্নে তুলে রেখেছে। এ নিয়ে কি কমদিন ও বকুনি খেয়েছে।

দাওয়ায় উঠে দেওয়ালে পেরেকে টাঙানো একপাটি খড়ম দেখিয়ে

উল্কা। এটা কী ?

ছোট-বৌ পরম কৌতুকে হেসে উঠে

ছোট-বৌ। এ আমার ঘরে ভরতের শ্রীরামচন্দ্রের খড়ম-প্রতিষ্ঠা।··· তখন সবে সমরের পৈতে হ'য়েছে। নতুন-বামুনের নতুন-খড়ম। দাওয়ার এইখানটা বসে, সমর একদিন বিকেলে বই পড়ছে। কোত্থেকে ছুটে এল রাধা, বল্লে—সমুদা, ঐ ঘুড়ি কেটে যাচ্ছে আমায় ধরে দেও। সমর বই রেখে, খড়ম ফেলে ছুটল ঘুড়ির পেছনে। পাড়ার ভুলোকুকুরটা কোন্‌-ফাঁকে এসে সন্তর্পণে এক পাটি নিয়ে পালিয়েছিল, কেউ দেখেনি। ঘুড়ি পাওয়া গেলনা, সমর যখন ফিরলে, তখন খড়মও এক পাটি খুঁজে পাওয়া গেলনা।

সেই-খড়ম খেলবার জন্যে রাখলে রাধা। রাধা বড় হ'লে সেই খেলার সামগ্রী হ'ল পূজার ঠাকুর। কতনা চন্দনের ছিটে, কতনা ফুল ওর মাথায় পড়েছে প্রতিদিন। আজও সে সমরের স্মৃতি বহন করে চলেছে।···

উল্কা। এই বইগুলো বুঝি রাধার?

অপর দেওয়ালের কুলুঙ্গি থেকে কতকগুলি বর্ণপরিচয় প্রভৃতি বই নামিয়ে

ছোট-বৌ। এই বইতেই হাকিম সমরের প্রথম বর্ণপরিচয়। প্রথম অভ্যাসের লেখা এই তার নাম। এই বইতেই রাধারও বর্ণপরিচয় হয় সমরের শিক্ষায়। আজও এগুলি অম্লান অস্তিত্বে রাধার সঞ্চয় হয়ে আছে। একদিন এগুলি নামে, যেদিন ইস্কুলের সরস্বতী পূজা। হেডমাষ্টার মশায়ের নির্দেশে এগুলির স্থান মায়ের পায়ের তলায়। তিনি বলেন, দেবীর বর এই বর্ণবোধের মধ্য দিয়েই এসেছিল এ-মন্দিরে।

অপর পার্শ্বে তার হাত ধরে চালনা করে নিয়ে গিয়ে বসেন দেওয়ালে টাঙানো একখানি রাধাকৃষ্ণের যুগল পটের সম্মুখে

এই পটের ছবি, ওর প্রতিদিনের কাকুতিতে হয়েছে মুখর। কতনা-নিষ্ঠা, কতনা-সত্য, কতনা-মিনতির অশ্রুজলে-ভেজা-পটের ছবি! সরল-শিশুর আধভাঙা-বুলির মন্ত্রে পূজো-করা-পটের ছবি!

উল্কা আঁচলে চোখ মুছে। ছোট-বৌএরও চোখে আসে জল

কোথায় সেই উৎস—কোথায় সেই উৎসাহ! কথার মানুষই গেল হারিয়ে।

উল্কা। সেই যাবার দিনের কথা—

ছোট-বৌ তাক্ থেকে বেহালাটা নামিয়ে এনে বলতে থাকেন। পশ্চাতে সকলের অলক্ষ্যে এসে দাড়ান কৃপাময়ী। তিনি বেহালা দেখে চম্‌কে ওঠেন

ছোট-বৌ। দিদিকে উদ্দেশ করে বড়ঠাকুর বললেন—তুমি সাক্ষী গিন্নী, আমার সমুর জন্যে তোমার রাধাকে নিলাম ছোট-বৌ। এই বলেই

তিনি ঘড়ি দেখে উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠে, যেতে-যেতে-ফিরে-এসে বেহালাটা আমার সামনে রেখে বললেন—এই বেহালাটা আমার রাধামাকে দিও। এ আমি তাকেই দিলাম। সে বাজাবে আর ঠাকুরকে ডাকবে,—ঠাকুর, সমুদ্রাকে হাকিম কর।

ছোট-বৌএর চোখে নামে ধারা। আর কৃপাময়ী ওঠেন উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে। হঠাৎ ফিরে ছোট-বৌ কৃপাময়ীকে দেখে লজ্জিত হন। ছোট-বৌ অপরাধের কুণ্ঠায় মুখ ভরে কী করবেন ভাবতে থাকেন

উল্কা। এতবড় সত্যকে অস্বীকার করবে কে?

সেইক্ষণে নেপথ্যে সর্বেশ্বর ডাকে

সর্বে। (নেপথ্যে) ছোট-বৌ!

ছোট-বৌ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেরিয়ে যান

উল্কা। (কৃপাময়ীর পাশে যেয়ে) মা!

কৃপাময়ী স্থির ভাবে অবারণ-অশ্রু-চোখে দাঁড়িয়ে থাকেন। সমর মাকে ডাকতে ডাকতে প্রবেশ করে

সমর। মা! মা!

কৃপাময়ী তবু অনড়

তুমি বলে দেও মা আমি কী করব?

কৃপা উচ্ছ্বসিত ভাবে কেঁদে উঠে বলেন

কৃপা। আমি যে নিজেই জানিনা বাবা! মা! মা!

তিনি উল্কাকে জড়িয়ে ধরেন। উল্কা প্রশান্ত মূর্তিতে ধীরে ধীরে আপনাকে মুক্ত করে নিয়ে সমরের সম্মুখীন হয়

উল্কা। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, একটু বাইরে যাবে?

উল্কার অনুগমন করে সমর। উভয়ে বেরিয়ে যায় ভিতর বাড়ীর দিকে। কৃপাময়ী চক্ষু মুছে ধীরেধীরে মাটিতে বসেন। এদিকে ওদিকে চেয়ে চোরের মত প্রবেশ করে রাধা। কৃপাময়ীর পাশে যায়

রাধা। জ্যাঠাইমা!

কৃপাময়ী চোখ মোছেন

কৃপা। কী মা?

রাধা। তোমার নামে চিঠি।

রাধা চিঠি বের করে

কৃপা। (পরম বিস্ময়ে) কে দিলে মা?

রাধা। আমার মৃত্যুঙ্কা। ভিখারী মৃত্যুঞ্জয়।

কৃপা। কী লিখেছে?

রাধা। আরজি!

কৃপা। তুমি পড় মা, আমি শুনি।

রাধা চিঠি পড়তে থাকে

রাধা। হে মহিমান্বিতা! হে বিচারক জননি!

আমার নিবেদন, তোমার ছেলের কাছে আমার অপরাধের বিচারের সুব্যবস্থা তোমাকে করে দিতে হবে। আমার অপরাধ! এমনি গর্হিত সে অপরাধ যে, সমাজে ফেরবার মুখ নেই। বহুদিন আগে, তখনও আমার চোখে ছিল স্বপ্নের ঘোর। একটি ছেলে আর স্ত্রী নিয়ে আমার সুখের সংসার ছিল। ঐ তোমারই মত ছেলেটিকে গড়ে তোলবার নেশায় তখন মন আমার ভরপুর। ঠিক—

কৃপা। (নিরুদ্ধ নিশ্বাসে) কী···কী···পড়লে মা? দেখি দেখি?

তিনি তার হাত থেকে কেড়ে নেন্ চিঠি। নেপথ্যে ছোট-বৌ ডাকেন। তিনি চিঠি পড়তে থাকেন

ছোট-বৌ। (নেপথ্যে) রাধা!

রাধা। মা ডাকছেন। আমি শুনে আসছি জ্যাঠাইমা!

সে চলে যায়। অবারণ অশ্রু চোখে চিঠি পড়ে তিনি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠেন

রুপা। ঠাকুর! এও কি সম্ভব! ঠাকুর! একি সত্য!

তিনি চকিতে উঠে দাঁড়ান। তাঁর চক্ষে তখন জলের বন্যা। দেহে ঝড়ের বেগ।
তিনি বেরিয়ে যান। প্রবেশ করে সমর ও উল্কা

সমর। মা! মা কৈ?

উল্কা। আমি তাঁকে ডেকে আনছি, তাঁর সামনেই মীমাংসা হয়ে যাক।

সমর। কিন্তু উল্কা—

উল্কা। স্বয়ংবর-সভায় আমার হাতের মালা যদি তোমার গলায় না পড়ে, তবে জানব-যে এ বিধাতারই শুভেচ্ছা।

সমর। কিন্তু উল্কা এ আঘাতের ঘা—

উল্কা। এই আঘাতকেই যদি মর্মান্তিক বলে মেনে নিতে হয়, তবে আমার স্থান হবে আবর্জনার আস্তাকুঁড়ে। আমার মিনতি, আমাকে তুমি আশীর্বাদ কর--যেন এই দুঃখের মধ্য দিয়ে আমার মনে মুক্তির আনন্দ জাগে। সব লাভ ক্ষতি মিলিয়ে যা থাকবে, সেই সত্যকার আমি। সে-আমি পঙ্গু নয়, কাঙাল নয়, রুগ্ন নয়, সে জ্যাঠাইমার শক্তহাতের তৈরি আমি।

সেইক্ষণে বেগে প্রবেশ করে রাধা। উল্কা সমরের হাত ছেড়ে সরে দাঁড়ায়।
তার চোখে জলের বন্যা

রাধা। জ্যাঠাইমা!

সে সমর ও উল্কাকে দেখে বিব্রত হয়। সে থাকবে কি যাবে ভেবে পায় না।
উল্কা চকিতে চোখমুখ হাসিকান্নার রামধনুতে ভরে রাধার হাত ধরে

উল্কা। এই-যে তোমাকেই আমরা খুঁজছিলাম ভাই।

রাধা বিস্মিত হয়। সমর হয় বিব্রত

ওঁকে বলছিলাম--পটের ঠাকুরের সামনে তোমার সমুদাকে হাকিম করবার সাধনা।

সমর। (বিব্রতভাবে) সত্যি, মা কোথায় গেলেন ?

উল্কা। মায়ের খোঁজ আমি করছি।

সে বেরিয়ে যায়

সমর। তুমি—

রাধা। আমায় তুমি খুঁজছিলে সমুদা ?

সমর। তোমায় ঠিক···হ্যাঁ, তোমায় বলছিলাম—(চারিদিকে চেয়ে) মা কোথায় গেলেন ?

রাধা। তিনি তো এইখানেই বসে চিঠি পড়ছিলেন।

সমর। চিঠি ? কার চিঠি ?

রাধা। আমার মৃত্যুঙ্কার।

উল্কা প্রবেশ করে

উল্কা। মা তো বাড়ীতে কোথাও নেই।

সমর। (উদ্বিগ্ন ভাবে) মা নেই !

রাধা। (আপন মনেই) তবে কি চিঠি পড়ে—

সমর। কী ?

রাধা। ইস্কুলের দিকে গেলেন ?

সমর। একা, সন্ধ্যায় মা গ্রামের পথে—

সমর বেরিয়ে যায়, রাধা অনুগমন করে। উল্কা স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে

ষষ্ঠ দৃশ্য

পূর্বদৃষ্ট ইস্কুলের হল-ঘর। প্রবেশ করে টলতে টলতে মৃত্যুঞ্জয়। সে কাঁপতে-কাঁপতে কোনরূপে উঠে দাঁড়ায় সভাপতির মঞ্চে টেবিল ধরে

মৃত্যুন। এই যে তোমরা সব এসেছ। হুঁম্! আজ তোমরা বিদায়-প্রার্থী এখানে সম্মিলিত হয়েছ। প্রবেশিকা পরীক্ষার তোরণপথে, তোমরা ইস্কুলের পাঠ সঙ্গে করে, চলেছ বৃহত্তর-জীবনের তীর্থপথে। হে তীর্থ যাত্রী! তোমাদের যাত্রাপথ নির্বিঘ্ন হ'ক এই কামনা করি। তোমরা চলে যাবে—সেইটেই আজ আমার কাছে বড় কথা। এমনি প্রতিবৎসর তারাও গেছে। হুঁম্! এমনি করে আমার এক বৃহৎ সংসার গড়ে উঠেছে। এ যেন বিশ্বের বিপুল পথে আমার অসংখ্যছাত্রের বিরাট শোভাযাত্রা! তাদের মুখ, তাদের নাম, আমি তো ভুলিনি, আমি তো ভুলিনা। যারা গেছে, তাদের অনেকে আজও ফেরেনি! কিন্তু, ফিরবে—একদিন যেমন তোমরাও ফিরবে, যেদিন জাগবে তোমাদের মনে এই ভোলা মাষ্টারের কথা। সেদিন তোমরা দেশের মান্যগণ্য দশের একজন। আমি বার্ধক্যে জীর্ণ—স্থবির। চোখের জ্যোতি নিষ্প্রভ। তবু সেই দৃষ্টিহীনতার কুহেলির মধ্যেই আমি তোমাদের চিনব। বলব—কে? আমার তাপস না? হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই তো। বাপের মত তেমনি ফুটফুটে লম্বা চওড়া হয়েছিস। হয়তো চিনতেও পারবনা। সেই বয়স্ক-মুখের মধ্যে আমার শিশুছাত্রের সন্ধান মিলবে না। চরণ বলবে,—ওরে, বুড়ো ভোলা মাষ্টার আমাদের ভুলে গেছে। আমি তখন চিনতে পারব! বলব,—না না—ওরে, আমি ভুলিনি। এই যে আমি চিনেছি। আমি কি তোদের ভুলতে পারি। কে? আমার চরণ না?

সে ধীরে ধীরে নেমে আসে সম্মুখ ভাগে। বসে মঞ্চের উপর

ওরে, তোরা যে আমার বুকে তোদের সমস্ত শৈশব-চাঞ্চল্য নিয়ে বসে আছিস। তার দোলা যে আমি প্রতিক্ষণ পাই। সেই-স্মৃতির কতনা খুঁটিনাটি আজও আমি বুকে ধরে আছি।

সে বাঁশী বের করে চোখের সম্মুখে ধরে

আমার সময়। আমার সমু—

প্রবেশ করেন কৃপাময়ী প্রোজ্জ্বল চোখে তার দিকে চেয়ে। দেহে তাঁর নটরাজের মতন। মৃত্যুন চম্‌কে ওঠে পদশব্দে

মৃত্যুন। কে!

কৃপা। কে!

মৃত্যুঞ্জয় পালাবার বৃথা প্রয়াস পায়

দাঁড়াও! যেয়োনা দাঁড়াও! দেখতে দেও তুমি কে!

মৃত্যুন এগিয়ে এসে ফিরে যায়

তুমি!

মৃত্যুন। আমি।

কৃপা। একি সত্য?

মৃত্যুন উৎকট ভাবে হেসে উঠে

মৃত্যুন। মিথ্যে! মিথ্যে! এ—সব মিথ্যে!

কৃপা। কিন্তু ঐ বাঁশী?

মৃত্যুন। না না, এ বাঁশী যে আমার।

কৃপা। জানি, ও বাঁশী আমার—

মৃত্যুন। না না, এ বাঁশী আমার। এ বাঁশী আমি কাউকে দেব না। দিতে পারব না।

সে প্রাণপণ বলে বাঁশী বুকে ধরে লুটিয়ে পড়ে পাশের বেঞ্চির উপর

কৃপা। ও বাঁশী থাক চির-সত্য হ'য়ে তোমারই। আমি নেব না—নিতে চাই না।

মৃত্যুন ফিরে চায়

মৃত্যুন। তবে?

কৃপা। তুমি আমার স্বামী—দেবতা। ওগো বলে দেও, কী অপরাধে আমার এই শাস্তি!

তিনি লুটিয়ে পড়েন তার পদতলে

মৃত্যুন। অপরাধ? শাস্তি? শাস্তি তো আমি কাউকে দিইনি। একবার আমার দিকে চেয়ে দেখ—শাস্তি নিয়েছি আমি নিজে।

কৃপাময়ী ধীরে ধীরে উঠে বসেন

কৃপা। কেন? কী তোমার অপরাধ?

মৃত্যুন। এমনি গর্হিত সে-অপরাধ-যে তার মার্জনা নেই। তাই আমি আছি নিচে দূরে অপরাধের কুণ্ঠায় মুখ ভরে করজোড়ে। হে বিচারক! তুমি দণ্ড দেও।

দুই হাতে মুখ ঢাকে

কৃপা। তুমি কেন থাকবে দূরে? তোমার খোকা—সে যে তোমারই দর্পণ। তোমারই আলোক-আদর্শ-যে তার মধ্যে প্রোজ্জ্বল।

মৃত্যুন। তাই তো আমি পারি না তার কাছে যেতে। তাই তো অন্তর বিগ্রহে হই অনুক্ষণ কাতর। প্রতিপলে মনে হয়, ছুটে গিয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলি,—হও তুমি বিচারক, হও তুমি মহিমময়, তবু তুমি যে আমারই সৃষ্টি, তুমি যে আমারই কীর্তি, তুমি যে আমারই আদর্শ জীবন্ত।

কৃপা। (তার হাত ধরে) চল। ওগো, তাই চল। ওগো, তুমি তাই বল। চল, আমি তোমার হাত ধরে তোমাকে তারই কাছে নিয়ে যাই।

কৃপাময়ী তাকে টেনে নিয়ে যান অপর পার্শ্বে। মৃত্যুন তার সর্বাঙ্গের সঙ্গে হয় যুদ্ধে রত। আপনাকে মুক্ত করে নেয়

মৃত্যুন। না না না। এত বড় লোভ তুমি আমাকে দেখিয়ো না। হয়তো আমার সঙ্কল্প যাবে টুটে, আমি ছুটে যাব তার বুকে।

কৃপা। তাতে তো অপরাধ নেই।

মৃত্যুন মঞ্চের সম্মুখ ভাগে বসে পড়ে

'মৃত্যুন। তুমি কী বুঝবে, কত-না-অপরাধ জমে যাবে তারই ফাঁকে-ফাঁকে। মুহূর্তে তার যশ ও গৌরব ধূলোয় যাবে লীন হ'য়ে। সন্তানের হবে অকল্যাণ।

কৃপা। তুমি কী বলছ—আমি যে বুঝতে পারছি না।

মৃত্যুন। কী করে তুমি বুঝবে।

কৃপা। কেন ?

মৃত্যুন। দেখছ ? কী দেখছ ?

কৃপা। দেখছি, তুমি আমার ইহকাল পরকাল—সকল দেবতার ঈশ্বর।

মৃত্যুন। দেখছ লেখা আছে ক্ষতের মত গভীর কালো রেখায়—

কপাল দেখিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়

কৃপা। কী ?

মৃত্যুন। চোর।

কৃপা। চোর !

কৃপা ভয়ে বিস্ময়ে যায় পিছিয়ে—মৃত্যুন হয় অগ্রসর

মৃত্যুন। আমি চোর—আমি চোর !

কৃপা। এ কি শুনি, তুমি চোর ?

মৃত্যুন। মানুষই হয় চোর। কোন সংস্কার, কোন সংস্কৃতিই মানুষকে সে লোভের মোহ থেকে দূরে রাখতে পারে না। মানুষই হয় চোর।

কৃপা। তুমি চোর !

মৃত্যুন। ইস্কুল ফণ্ডের টাকা—

কৃপা। (পরম আগ্রহে) সে তো গুণ্ডা কেড়ে নিয়েছিল।

মৃত্যুন। সে গুণ্ডা নয়। হে অপ্রকাশ! আমাকে প্রকাশ কর। তুমি বিশ্বাস কর—

কৃপা। তুমি যে আমার স্বামী—

মৃত্যুন। জানি, তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না। ইস্কুলের চালা ওঠে যার হাতে, ইস্কুল বিল্ডিংএর টাকা তারই হাতে পায় লোপ। সেই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে। ছেলের বড় হবার পথের প্রতিবন্ধক দুহাতে দিয়েছি সরিয়ে। শুধু, ন্যস্ত বিশ্বাসকেই অপহরণ করিনি, হয়েছি মিথ্যার জাল বুনে জালিয়াত।

কৃপা। তুমি জালিয়াত!

মৃত্যুন। কৌশলে করেছি আত্মগোপন। গঙ্গাতীরের ভাঙ্গা বাক্স, পিরাণের পকেটের সেই অপ্রয়োজনের তিন হাজার টাকা, আর গঙ্গায় ভেসে যাওয়া লাশ—সে যে আমারই কামনা, সে যে আমারই রচনা।

কৃপা। তুমি জালিয়াত?

কৃপাময়ীর সর্বাঙ্গ কাঁপতে থাকে

মৃত্যুন। তাই তো আমি পারি না আমার সন্তান—আমার বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াতে। এত বড় অপমান—সেই কি হবে আমার শেষ দান! না না, সে আমি পারব না। আমার খোকা, আমার সাত-রাজার-ধন-এক-মাণিক থাক জন্ম-জন্ম বিচারক।

কৃপা। তুমি স্বামী—আমার সকল দেবতার ঈশ্বর। তোমার কথাই সত্য। কিন্তু হে সত্যাশ্রয়ী! কিসের লোভে তুমি এতবড় মিথ্যার পাঁকে ডুবলে?

মৃত্যুন। জানি না, আজও তোমার মনে আছে কী না। একদিন খেলাচ্ছলে বলেছিলাম—কোন হীনতাই আমার হীনতা নয়,—যা আমি বরণ করতে কুণ্ঠিত আমার ছেলেকে হাকিম করতে। সে আমার খেলা নয়, সে ছিল আমার সঙ্কল্প। তাই তো যেদিন আমার হাতে এল ইস্কুল ফণ্ডের

টাকা, সেদিন অবলীলায় নিলে বিদায় আমার সত্য-সুন্দর অন্তরের স্বর্গ থেকে। আত্মবিলোপই আমি বরণ করলাম আমার আত্মজকে বিচারক করতে।

সহসা কৃপাময়ীর চোখ জ্বলে উঠে। সে দৃঢ়পদে এগিয়ে এসে ধরে মৃত্যুনের হাত। তাকে টেনে তোলে

কৃপা। যদি অপরাধই করেছ, তবে দণ্ড নিতে ভয় কেন? চল আমার সঙ্গে। বিচারকের দণ্ডই তোমাকে নিতে হবে।

মৃত্যুন আপনাকে মুক্ত করবার প্রয়াস পেয়ে বলে

মৃত্যুন। না না, আমি পারব না। দণ্ডকে ভয় নেই—দণ্ড আমি নিয়েছি।

আপনাকে মুক্ত ক'রে সে বলতে থাকে

দীর্ঘ চৌদ্দবৎসরের এই-যে-আত্মগোপন, সে-যে-হাকিমের হুকুমের চেয়েও নির্মম, মৃত্যুর চেয়েও চরম। আমি আছি, কিন্তু আমার কিছু নেই। তুমি আছ, আছে আমার খোকা প্রতিদিনের সূর্যোদয়ের মতই সত্য। ছায়ার মত ফিরি তার পাশেপাশে—তার স্পর্শ আমি পাই না। পাবি না তাকে বুকে তুলে নিতে! এ কি কম দণ্ড! কোন বিচারকের তূণে আছে এর চেয়েও কঠোর দণ্ড?

কৃপা তার পদতলে লুটিয়ে পড়ে

কৃপা। হে ঠাকুর! এ তুমি কী করলে?

মৃত্যুন। কত বড় আদর্শে অনুপ্রাণিত আমার খোকা। সে যদি জানে, এতবড় মিথ্যার ভিত্তিতে তার প্রতিষ্ঠা—তবে যে সে ঝড়ের মুখে বালির ঘরের মতই পড়বে লুটিয়ে মাটিতে।

মৃত্যুন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁপতে কাঁপতে

এ পাপ আমার সয়েছে, হয়তো তোমারও সইল—সইবে কি তার? তাকে জানিয়ো না। ওগো, আমার মিনতি তাকে জানিয়ো না। সে যে

আমাব ছেলে, সে যে তোমারই ছেলে। এতবড মুক্তি আমার সইবে না।

সমব। (দূবাগত কণ্ঠ) মা '

রূপা। (চম্‌কে উঠে) খোকা।

কৃপাময়ী উঠে দাঁডায

মৃত্যুন দেহের সমস্ত বলপ্রয়োগে কাপতে কাপতে আর টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। চোখে তার আনন্দ উৎসবের দ্যুতি

মৃত্যুন। খোকা।

মৃত্যুন অসহ্য উত্তেজনায় দুলতে থাকে। সহসা তার কা হয—কাতরোক্তি করে ওঠে। তার দেহের একাংশ অবশ হয়ে যায পক্ষাঘাতে। সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। কৃপাময়ী তার মাথা আপনার কোলে তুলে নেয়

আমাব মিনতি—দিযোনা তুমি আমাব পরিচয়। এসেছে আমার মুক্তি —বিদায।

সমব। (নেপথ্যে) মা।

কৃপাময়ী অবারণ অশ্রু চোখে কাপতে কাঁপতে ওঠে দূরে সরে যান। প্রবেশ করে সমর ও রাধা

সমব। মা।

কৃপা। একটু জল।

বাধা। আমি আনছি জ্যাঠাইমা।

রাধা ও সমর বেরিয়ে যায়। কৃপাময়ী তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েন

কৃপা। তোমাব এই চরম-লগ্নেও কি তুমি দেবে না তোমার পরিচয়! ওগো, দেও তোমার পরিচয, অপরিচযের কুহেলি যাক কেটে।

মৃত্যুন। না না, আমার মিনতি সমর···রাধা···

কৃপাময়ী উঠে দূরে সরে দাঁড়িয়ে অন্তর সংগ্রামে রত হন। সর্বাঙ্গ তাঁর দুলতে থাকে।
সমর ও রাধা প্রবেশ করে। সমরের হাতে মাটির গ্লাস

সমর। জল এনেছি মা।

কৃপা। ওঁর-মুখে একটু জল দেও বাবা।

সমর মাটিতে বসে মৃত্যুনের মাথা আপন অঙ্কে তুলে নিয়ে মুখে জল ঢেলে দেয়।
রাধা যেয়ে বসে বুকের কাছে। কম্পিত হাতে ধরে মৃত্যুন সমর ও
রাধার হাত। মৃত্যুন মৃত্যুর সঙ্গে সংগ্রাম করে কী বলবার
প্রয়াস পায়। কণ্ঠে বাণী যোটে না

সমর। একে কি তুমি চেন মা ?

কৃপা। (অবিচলিত কণ্ঠে) না—না—না।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে

ভিখারী। চির ভিখারী মৃত্যুঞ্জয়।

যবনিকা

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা